https://boierpathshala.blogspot.com

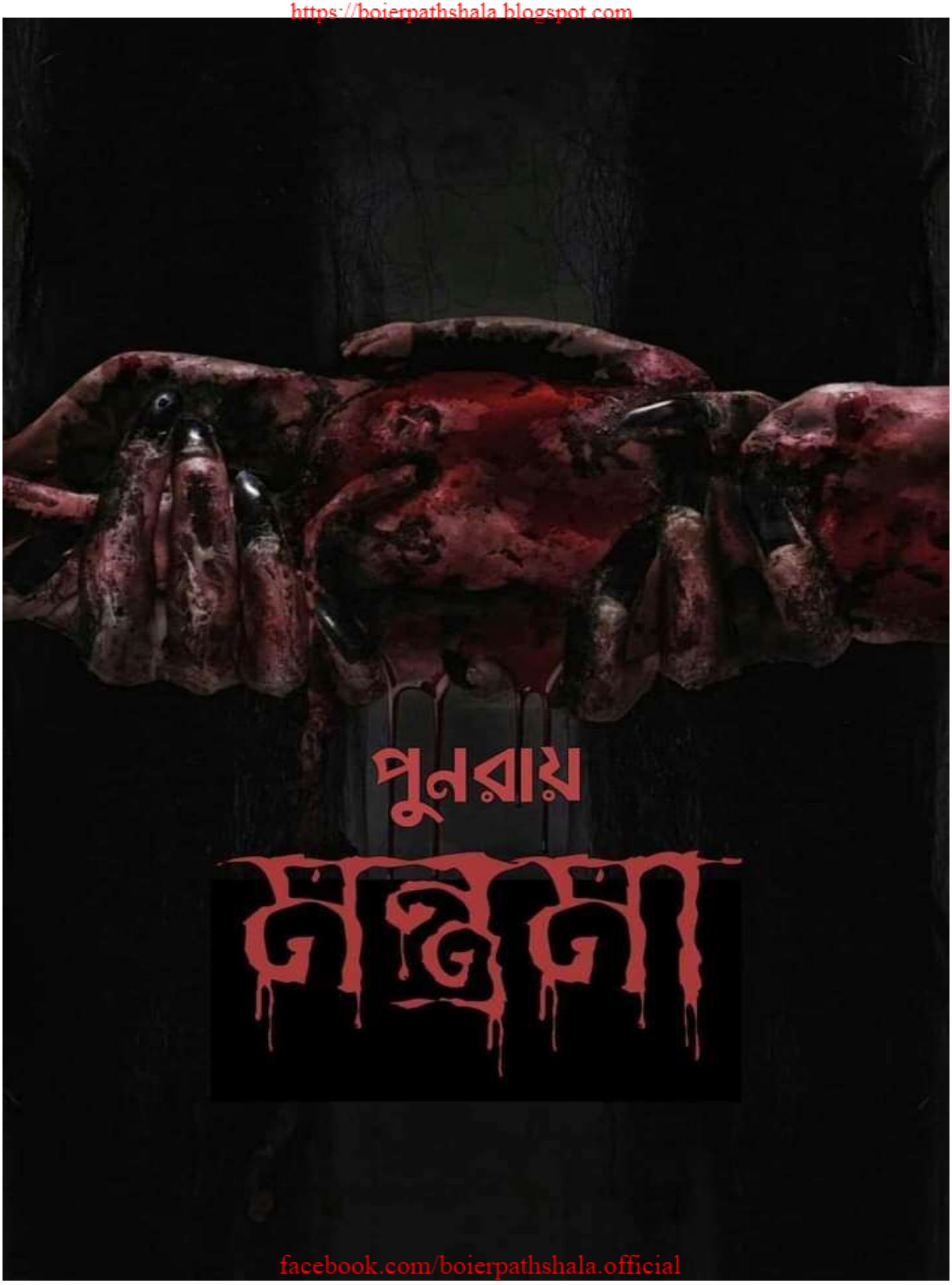

facebook.com/boierpathshala.official

https://boierpathshala.blogspot.com

পুনরায় মন্ত্রমা

অঙ্কুর বর

facebook.com/boierpathshala.official

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন

https://boierpathshala.blogspot.com

অথবা

www.boidownload24.blogspot.com

ফেসবুক

fb.com/boierpathshala.official

facebook.com/groups/boidownload

we don't scan any books. We collected it from Internet.

Download the pdf only for Entertainments Not for Bussness purpose.

আচমকা জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণটা কামড়ে ধরল উলি। দিনের বেলা হলেও,এই ঘরের ভেতরে খুব একটা যে আলো ঢোকে না, তা এই ঘরে প্রবেশ করেই বুঝতে পেরেছিল সে। দিলিপ রানার বাড়ি চাঁইপাটের পাশের গ্রাম নিতিরামপুরে। অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছলও নয়। নিজের যে কাঠা পনেরোর মত জমি রয়েছে সেই জমিতেই চাষাবাদ করে সে। এই বাড়ি তারই। দশ বাই বারো এই ঘরের দেওয়ালগুলো মাটির আর বেশ চওড়া। আর আলো বলতে দক্ষিণের দিকের দেওয়ালের শিঁক লাগানো একটাই মাত্র জানালা। সেই জানালার বাইরে আবার বড় বড় গাছ গাছালির আড়ম্বর। সেই সবের ফাঁক গলে ঘরের ভেতরে যেটুকুও আলো ঢোকার কথা, সেটুকুর ও পথ আটকে রেখেছিল,একটা ফিনফিনে ফুল ছাপের মলিন কাপড়। খানিকটা পর্দার আদলে। সেই কাপড় এখন পতপত করে পতকার ঢঙে ওড়ার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। আর উলির দুশ্চিন্তা সেখানেই। সে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়েই টের পেয়েছে, দক্ষিণের দিকের আকাশের এক কোণে একটা কালো মেঘ দ্রুত, ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। উলির অভিজ্ঞ চোখ। সে বুঝতে পারছে, একটা প্রচণ্ড ঝড়,বাদলা নেমে আসতে খুব একটা বেশী দেরী নেই। নিতিরামপুর থেকে চাঁইপাটের দূরত্ব খুব একটা নয়। কিন্তু মাঝে নোনাকুরির জঙ্গলটা পড়ে। হিসেবমত বেলা থাকলেও যে মেঘ জমেছে আকাশে তাতে চারপাশ জুড়ে আঁধার ঘনাতে খুব একটা সময় নেবে না। বাড়ি ফিরবে কী করে এখন তাঁরা?

ঘরের ভেতরে অনেকক্ষণ ধরেই একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছিল। আচমকা সেই গোঙানির আওয়াজ চিরে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসতেই চমক ভাঙে বছর চল্লিশের উলি দাসের। তার সামনেই,মেঝের ওপর একটা মাদুর পাতা। আর সেই মাদুরের ওপরেই এলিয়ে পড়ে রয়েছে দিলিপ রানার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ময়না। আসন্ন সন্তানসম্ভবা সে। তাই আজ এখানে উলির আগমন। কিন্তু উলি,আজ এখানে একা আসেনি। প্রত্যেকবারের মত সাথে এসেছে তার মেয়ে ফুলি। সে বসে রয়েছে,ময়নার মাথার দিকে। খানিকটা চিন্তিত মুখেই সে উলির

দিকে তাকিয়ে। ময়নার অবস্থা সে, খুব একটা ভালো বুঝছে না। কমদিন হল না সে মায়ের সঙ্গে রয়েছে। দিন দিন তারও অভিজ্ঞতা বাড়ছে। সে আজকাল অনেককিছু বুঝতে পারে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত আরো দু তিনজন মহিলা রয়েছে। উলি,তাঁদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "আর সময় নেই গ। সময় হয়ে এসেছে। গরম জল এনেছ?"

উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে একজন সম্মতি সুরে মাথা নাড়িয়ে, উলির বামদিকে নির্দেশ করতেই উলি দেখতে পেল, সেখানে একটা হাঁড়িতে করে গরমজল আর কিছু পুরনো সুতির কাপড় এনে রাখা হয়েছে। উলি সেদিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাবে, তার আগেই আবার দিলিপের বউ এর একটা আর্তনাদ।

"পেটের তলে চাড় দিচ্ছে বোদয়। " ঘরে উপস্থিত একজন প্রৌঢ়া কথাটা বলে উঠতেই,বছর কুড়ির ফুলি, বাকীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল,"এবার তোমরা সবাই বাইরে যাও। আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। "

"আমরা থাকি না ভেতরে? কিচ্ছুটি করবোনি। বরং হাতে হাতে জিনিসগুলো এগিয়ে দিই। তোমাদের তো সুবিধে হবে। " সেই প্রৌঢ়া কথাটা বিড়বিড় করে বলে উঠতেই, ফুলি তাকালো মায়ের দিকে। উলি যখন কোনো কাজে হাত দেয়, সে চায় না সেই সময় বাইরের কেউ সেখানে উপস্থিত থাকুক। পুরো ব্যাপারটাই, অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়ায় সে সম্পন্ন করে। কিন্তু সে পুরো জিনিসটাকে রাখে সকলের চোখের আড়ালে। একটা রহস্যের আবরণে মুড়ে। ফুলি এই ব্যাপারে একবার প্রশ্ন করায়, তার মা বলেছিল।

"সত্যি কথা কী জানিস, এই যে আমরা,দুটো মেয়ে মানুষ টিকে রয়েছি এই সংসারে যেখানে আশেপাশে লোভী , নোংরা,ভুখা হায়নারা ঘুরে বেড়াচ্ছে দাঁত নখ বের করে মেয়ে মানুষদের ছিঁড়ে খাবে বলে,সেটা এই রহস্যের জন্যই। এই আড়াল, এই মন্ত্র,আর এই রহস্যের কারণ হয়তো কিছুই না এর

জন্যই ওরা মনে করে আমরা সাধারণ নই। তাই আমাদের কাছাকাছি সকলে আসতে ভয় পায়। যেদিন এই রহস্য মুছে যাবে, দেখবি সকলে কেমন পিষে মারতে চাইবে। মনে রাখবি, এই রহস্য কিন্তু একটা বর্ম। এই বর্ম কখনওই খুলিস না। “

মায়ের কথার অনেককিছুই সেদিন ফুলি বুঝতে পেরেছিল। আবার অনেককিছুই সে বুঝতে পারেনি।

উলি,প্রৌঢ়ার সেই কথা শুনে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, “আমাদের সেসব গুপ্তবিদ্যা গো বৌদি। গুপ্তবিদ্যা, বাইরের লোকের সামনে দেখাতে নেই গো। যাও,গো যাও। বাইরে যাও। দোর দাউ দিকি ঝটপট। ওদিকে পোয়াতির...”

শেষের কথাগুলো কানে এলো না, ঘরের মধ্যে উপস্থিত মহিলাদের। একরকম প্রায় জোর করেই,ওদেরকে ঘরের ভেতর থেকে ঠেলে প্রায় বাইরে বের করে দিলো উলি। আর তারপরেই দড়াম করে দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলো সে।

“দেখলে,দিদি? দেখলে?” একজন মহিলা গলায় উষ্মা তুলে, সেই প্রৌঢ়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল,“কেমন, তেজ দেখলে?” এইরকম ভাবে জোর করে,একজন তাঁদের ঘরের ভেতর বের করে দিলো। তাও অন্য গাঁয়ের একজন, এটা সহজে হজম করবার মত ঘটনা মোটেও নয়। কিন্তু তাঁদেরই বা কী করবার? যে বের করেছে,সে সাধারণ কেউ নয়। সে যে মন্ত্রমা।

প্রৌঢ়াটি দক্ষিণের আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, “হম। দেখলাম। “

আর ঠিক তারপরেই একটা রিনরিনে ছড়ার স্বর বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসতেই চমকে উঠল উপস্থিত সকলে। ওদের মধ্যে একজন মহিলা, বদ্ধ দরজায় কান ঠেকিয়ে ভেতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করলও রহস্যময় ভঙ্গীতে। ওই... ওই সেই মন্ত্র। যে মন্ত্র পড়ে উলি পোয়াতিকে হাত

দিলেই, সুস্থ বাচ্চা জন্ম নেবেই নেবে...। যে মন্ত্র পড়লে,মা ও ছা ভাল থাকবেই থাকবে, সেই মন্ত্র।

"উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি

ফুলির পেটে ছা

ছা এর কপাল খা।

খাইতে গিয়ে ভুলি।

ফুলির ছানা খেলি।

ছায়ের নরম মাস

রক্ত চুষে যাস।"

****

চাইপাট গ্রামটি, হিন্দুল পীর থানার অন্তর্ভুক্ত।

থানাটি খুব যে একটা বড় তা নয়। আগে চাইপাট গঙ্গারারামপুর থানার অধীনে ছিল। থানা এলাকার পরিধি বড় হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই নানান অসুবিধের মধ্যে পরতে হচ্ছিলো চাইপাট ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিকে। সেই অসুবিধা নিরসনেই কয়েকবছর হল, এই নতুন থানাটির উদ্বোধন হয়েছে। যদিও এই থানাটি স্বতন্ত্র, কিন্তু তারপরেও এই থানাটি বকলমে নিয়ন্ত্রণ করে গঙ্গারামপুর থানাই। বড়বাবু, মেজবাবু ছাড়াও মাত্র তিনজন কনস্টেবল রয়েছেন থানাটিতে। যার মধ্যে একজন আবার মহিলা কনস্টেবল।

প্রধান সড়কের থেকে একটা সরু মোরামের রাস্তা ঢুকে গিয়েছে হিন্দুলপুরী গ্রামের দিকে। থানাটি প্রধান সড়কের থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটা দূরত্বে সেই মোরামের রাস্তারই একপাশে। থানার অফিসরুম মাত্র দুটো। তার মধ্যে একটায়, বড়বাবু, আর মেজবাবু বসেন। পাশের রুমটি স্টোররুম সহ

রান্নাবান্নার ভাঁড়ার ঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অফিসরুমদুটি ছাদওয়ালা হলেও, সামনের বারান্দাটি এসব্যাসটর্স দিয়ে ছাওয়া। সেই বারান্দারই একপাশে একটা বেঞ্চমত পাতা থাকে লোকজন এসে বসার জন্য। এই দুটি অফিসরুম ছাড়াও, থানার চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে আরেকটা ঘর। যার মধ্যে লোহার পাত দিয়ে দুটো সেল বানিয়ে রাখা হয়েছে। গঙ্গারামপুর থানায় চালান করবার আগে অপরাধীদের সাময়িক ভাবে রাখার জন্য। এছাড়াও চৌহদ্দির একপাশে দুটি টয়লেট ও একটি গাড়ি রাখার গ্যারেজ। বড়বাবু সুশোভন নস্কর রোজ আসেন না থানায়। আসলে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত সরকারী গাড়িখানা ওখানেই রাখা থাকে।

ঘড়িতে সময় রাত্রি, বারোটা পনেরো। থানা অফিসের কাছাকাছি ঘরবাড়ি তেমন নেই বললেই চলে। যে দু চারটে, চা পান বিড়ি সিগারেটের দোকান তারাও আটটার মধ্যে দোকানে ঝাঁপ ফেলে দেয়। ফলত, রাত বাড়ার সঙ্গেসঙ্গেই জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে ওঠে।

থানা চত্বরের সামনে খুব একটা আলো নেই। মূল অফিসরুমের সামনে একটা একশো পাওয়ারের বাল্ব, তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, অফিস চত্বরটিকে আলোকিত করার কিন্তু পারে আর কই। ফলত রাত হলেই, থানা চত্বর জুড়ে নেমে আসে, আলো আঁধারি মাখা এক ভুতুড়ে পরিবেশ।

আজ থানায় নাইট ডিউটিতে রয়েছে কনস্টেবল হরিহর পিলাই। আর পার্বণী মান্না। এমনিতেই ছোট জায়গা। ক্রাইমের পরিমাণ একেবারেই হাতেগোনা। তাই খুব একটা নাইটডিউটির প্রয়োজন পড়ে, না। আর পড়লেও কনস্টেবল পার্বতীকে, নাইট ডিউটিতে একেবারেই থাকতে হয় না। বড়বাবুর সঙ্গে তার বিশেষ হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। সেখান থেকেই সে এই সুবিধে পেয়ে থাকে। কিন্তু আজ ব্যাপারটা অন্যরকম। কাল প্রায় ভোররাতে থানায়, একজন নতুন মহিলা অপরাধীকে আনা হয়েছে চাইপাট থেকে। একাধিক খুনের ঘটনায় জড়িত থাকা ছাড়াও চক্রান্ত, হুমকি ভয় দেখানো সহ আর নানান কিছুর অভিযোগ। আজকেই হিসেব মত মহিলাটিকে গঙ্গারামপুর থানায় চালান করে দেওয়ার কথা, কিন্তু

আচমকাই, বড়বাবুর মেয়ের শরীরটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তিনি আজ থানায় উপস্থিত হতে পারেননি। তাই ক্রিমিনাল ট্রান্সফারের যাবতীয় কাজ আটকে গিয়েছে আজকের জন্য। কাল তিনি থানায় আসলে, কালকেই এই মহিলাকে গঙ্গারামপুরে চালান করে দেওয়া হবে।

"পার্বতী, একবার গিয়ে দেখে আসবে নাকি?" আচমকা হরিহর পিলাই এর গলা পেয়ে, পার্বতী মান্না, ফোনের স্ক্রিন থেকে নজর সরালো। এই মুহূর্তে ওরা দুজন, অফিসরুমে বসে। হরিহর পিলাই মেজবাবুর চেয়ারে বসে এতক্ষণ ঢুলছিল। আর পার্বতী বড়বাবুর চেয়ারে বসে কানে হেডফোন লাগিয়ে, ইউটিউবে মেকআপ টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো দেখছিল। হরিহরদার কথা শুনে, পার্বতী বলতেই যাচ্ছিল, " আপনি তো নিজেই যেতে পারেন হরিহর দা। " কিন্তু আচমকা নিজেকে থামিয়ে নিলো সে। গতবারে হরিহরদাই মহিলাটিকে খাওয়ার দিয়ে এসেছে। বারবার যেতে হলে কালকে যদি বড়বাবুর কাছে রিপোর্ট করে দেয় ওর নামে? এমনিতেও লোকটা তাকে খুব একটা পছন্দ করে না। সে, ফোনটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে ব্যাজার মুখে উঠে দাঁড়ালো।

ধুস! ভাল্লাগে না। মহিলাটির ওপর সে সকাল থেকেই খাপ্পা ছিল। এই যাওয়ার কথা শুনে সে আরো বিরক্ত হল। এমনিতেই তার নাইটডিউটি তে দীর্ঘদিনের অনভ্যাস তৈরী হয়েছে। আজ এই মহিলার জন্য তাকে নাইটডিউটি করতে হচ্ছে। আচ্ছা, মহিলার বয়স তো ভালই হয়েছে, দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু স্যার যে কালকে বললেন, খুব ডেঞ্জারাস মহিলা... আচ্ছা, কী যেন নাম ছিল মহিলার...

******

ঘরটা বেশ বড়। আর আলো বলতে দরজার কাছে লাগানো একতা টিমটিম করে জ্বলতে থাকা হলুদ আলো। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না ঘরের ভেতরটা। কিন্তু তারপরেও যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা গেলো, এই সেই থানার আটক ঘর, যেখানে কয়েদিদের রাখা হয়। ঘরে দুটো

মুখোখুখি লোহার পাত দিয়ে তৈরী লকআপ। ঈষৎ আলোয় দুটো লকআপেই দুটো মানুষের উপস্থিত টের পাওয়া যাচ্ছে। একটাতে, একজন এই গরমেও প্রায় আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর অন্য সেলটিতে একবছর পঞ্চান্ন ষাটের মহিলা, দেওয়ালের দিকে মুখ করে চুপ করে বাবু হয়ে বসে রয়েছে। নাহ, ঠিক চুপ করে নয়। বিড়বিড় করে, কতগুলো শব্দ বেরিয়ে আসছে, তার মুখ থেকে। ঠিক মন্ত্রচ্চারনের মত, কিন্তু ছড়ার সুরে··· কণ্ঠে যেন অপরিসীম ভয় জাঁকিয়ে বসেছে।

"কীরে? এখনো খাসনি?" কনস্টেবল পার্বতী ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে দেখল, মহিলার সেলের ভেতরে খাওয়ারের থালাটা এখনো ছোঁয়া হয়নি। হিসেবমত, হরিহর দা, ঘণ্টা দেড়েক আগে দিয়ে গিয়েছে খাওয়ারটা। "কীরে? খাওয়ারটা খাসনি কেন? দুপুরেরটাও খাসনি, এখনো খাবি না... অনসন করছিস নাকি?"

পার্বতীর গলা পেয়ে, পাশের সেল থেকে একটা পুরুষের গলা ভেসে এলো। এতক্ষণ যাকে আমরা কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে বলে ভেবে ছিলাম, সে আসলেই জেগে ছিল। একটা চল্লিশ বছরের রোগাপাতলা চেহারার পুরুষ। আজ দুপুরেই তাকে চুরির অভিযোগে ধরা হয়েছে।

"ও দিদি, পায়ে পড়ি। আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও..."

লোকটি প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় কথাটা বলতেই পার্বতী অবাক গলায় বলে উঠল, "তুই ঘুমোসনি? আর নিয়ে যাও মানে?"

"হ্যাঁ গো দিদি, এখান থেকে নিয়ে গিয়ে যেখানে পারে রাখো। কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমাদের পায়ে পড়ি। "

লোকটির ভয়ার্ত মুখ দেখে পার্বতীর এবার নিজের ভয় লাগলো।

"কি বলছিস কী? এখানে কী হয়েছে? কী সমস্যা? "

লোকটি উল্টোদিকের লকআপের ভিতর বসে থাকা মহিলার দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। "ওই যে... শুনতে পাচ্ছো? সারাক্ষণ বিড়বিড় করে ওই

এক জিনিস পাঠ করে চলেছে। একবারও থামছে না···এই অন্ধকার ঘরে, ওই রিনরিনে ছড়া শুনে বুকের ভেতরটা আপনা থেকেই ধুকপুক করছে ভয়ে। খালি মনে হচ্ছে, এই ঘরে আমরা দুটি ছাড়াও আরো কেউ রয়েছে লুকিয়ে। যাকে দেখা যায় না। আমি ওর সঙ্গে থাকবো না দিদি, আমায় তোমাদের ভাঁড়ারে রাখো তালা মেলে, কিন্তু পায়ে পড়ি, আমায় ওই মহিলার সঙ্গে রেখো না। “

পার্বতীর আলাদা করে শোনার দরকার পড়ল না। সে কাল থেকেই শুনে যাচ্ছে। মহিলাটিকে যখন আনা হচ্ছিলো, কালকেই সে শুনেছে এই ছড়া,

“উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি

ফুলির পেটে ছা

ছা এর কপাল খা।”

বারবার... বারবার... বারবার। এই এক ছড়া বলেই চলেছে সে। যেন কোন মন্ত্র।

পার্বতী হাতের লাঠিটা সজোরে বাড়ি মারল মহিলাটির লকআপের গ্রীলে। একটা ধাতব শব্দ উৎপন্ন হতেই, মহিলাটির গলার স্বর থেমে গেল মুহূর্তেই।

“এই? কথা কানে যাচ্ছে না?” চিৎকার করে উঠল পার্বতী, এসব পাগলামোর নাটক অন্যজায়গায় করিস। এখানে এসব একদম না। সব নাটক কালকের পর বেরিয়ে যাবে। আজরাতে যদি আর একবার ছড়া শুনতে পাই...

“উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি...”

কথাটা শেষ করবার আগেই মহিলাটির গলা থেকে বেরিয়ে এলো আবার সেই ছড়া। সেটা শুনেই রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল পার্বতীর। কী? এতো বড় সাহস? তাকে অবজ্ঞা করা, তাও একটা চোরের সামনে···?

"তবে রে!" প্রচণ্ড অপমানে পার্বতীর রাগে মাথায় আগুন জ্বলছে। বয়স্ক মহিলা বলে সে কিছুই বলবে না ভেবেছিল। কিন্তু আজ একে কিছু না কিছু শাস্তি দিতেই হবে। একটা চোরের সামনে নিজেকে ছোট করা চলে না। কিছু হলে সেটা বড়বাবুকে ম্যানেজ করে নেবে সে। কিন্তু একে তো শাস্তি দিতেই হবে। দ্রুত হাতে সেলের তালা খুলছিল সে... তার চাবির ঝনঝনানির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল মহিলার ছড়ার তেজ...

"এই... এই··· তোর এতো বড় সাহস..." লোহার গেটটা খুলেই সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো মহিলার দিকে, কিন্তু আচমকাই মহিলাটি ছড়া থামিয়ে হিশহিশে স্বরে বলে উঠল, "আসছে... আসছে সে... আসছে। "

থমকে গেলো পার্বতী, "কে? কে আসছে?"

পার্বতী দেখল, মহিলাটি ধীরে ধীরে তার দিকে ঘুরল। বাল্বের হলুদ আলো মহিলাটির ফ্যাকাসে মুখের ওপর পড়ছে। এই মহিলাকে আমরা চিনি। ইনি মাধুরীর শাশুড়ি, মালতী দেবী। সেই মালতী জেঠিমা, যিনি চেয়েছিলেন মন্ত্রমা এসে মিলির পেটের সন্তানটিকে নিয়ে যাক, কিন্তু পারেনি। শেষ মুহূর্তে, মিলি, মাদুবাবার পরামর্শ মেনে নিজের সন্তানকে জন্ম দিয়েছে এই চাইপাটের মাটিতে। হিসেব মত শেষ হয়েছে, মন্ত্রমার প্রকোপ। কিন্তু আজ এর মুখ এমন ভয়ে সাদা কেন? সেদিনের সেই দৃঢ়চেতা প্রৌঢ়ার মুখ আজ যেন কোথাও ঢাকা পড়ে গিয়েছে অপরিসীম ভয়ে। কিন্তু কীসের ভয়ে পাচ্ছেন এই মহিলা?

"পিশাচ! পিশাচ আসছে। "

"কে আসছে?" পার্বতী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কী বলছে এই মহিলা?

"পিশাচ···পিশাচ গো। আমি মিলিকে, বারণ করেছিলাম, ওরে, তোর গর্ভে পিশাচ রয়েছে। ভয়ঙ্কর পিশাচ। যে এতদিন ধরে জন্ম নিতে চেয়েছিল কিন্তু মন্ত্রমার জন্য পারেনি। তুই, ও সন্তান জন্ম দিসনি। ও সন্তান, জন্ম দিলে, মন্ত্রমা আর কিচ্ছুটি করতে পারবে না। আর পুরো চাইপাট ধ্বংস হয়ে যাবে। শোনেনি... শোনেনি সে আমার কথা। জন্মদিলো। সে জন্মদিলো ওই পিশাচ কে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম... আমি ওকে আটকাতে পাল্লাম না। পাল্লাম না। তোরা, পালা। পালিয়ে যা। বাঁচতে চাইলে পালিয়ে যা এক্ষুনি। সে এসে পড়ল বলে। "

পার্বতীর মহিলাটির কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। কী বলেছে এসব? পিশাচ, মন্ত্রমা, মিলি... কী এসব?

"এই···এই তুই ঘুমো। ঘুমো " পার্বতী টের পেল, আচমকাই তার কণ্ঠটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। "তোকে খেতে হবে না কিছু। চুপচাপ ঘুমো। আর শোন, একদম এসব ছড়া আউড়ে ওই ওকে বিরক্ত করবিনা। পাগল... ছাগল যত। "

কথাটা বলেই লকআপের বাইরে বেরোতে যাবে, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে একটা বিশ্রী খিকখিক হাসির শব্দ হতেই চমকে পেছন ঘুরল সে।

মহিলাটি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে খিক খিক করে। শুধু হাসছে না ধীর পায়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তার মুখোমুখি।

"কী হল? হাসছিস কেন?" পার্বতী অবাক। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, প্রচণ্ড ভয়ে মহিলাটির চোখ থেকে জল পড়ছে। কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে খিকখিক করে হাসির শব্দ।

আচমকা মালতীদেবী হাসি থামিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "এসে গেছে সে...!"

আর কথাটা শেষ করার সাথে সাথেই ঘরের ভেতরের একমাত্র বাল্বটা ভয়ঙ্কর ভাবে দপদপ করে জ্বলে উঠল। পার্বতী অবাক। বাল্বটার আবার কী

হল? এতক্ষণ তো ঠিকই জ্বলছিল। সে টের পাচ্ছে, ঘরের ভেতরের তাপমাত্রাটা হু হু করে নামছে। এসব কী হচ্ছে এখানে? নাহ, তার ভয় করছে হঠাৎ করেই। হরিহরদা কে গিয়ে ডেকে আনবে? নাকি... সে দ্রুত পায়ে লকআপের দরজার দিকে এগোতে গিয়ে যেই সামনের দিকে তাকালো আচমকা বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল।

তার উল্টোদিকের লকআপে যেই চোরটা এতক্ষণ, প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিল, সে এইমুহূর্তে লকআপের দুটো লোহার রডের মাঝে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত ভাবে। দুচোখ প্রচণ্ড আতঙ্কে বিস্ফারিত, অথচ মুখে চওড়া নিঃশব্দ হাসি। সে অপলক দৃষ্টিতে পার্বতীকে দেখছে।

"এই এই... তুই ওভাবে কী দেখছিস? কী দেখছিস ওভাবে?" পার্বতী বুঝতে পারছে, ভয়ে তার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। বুকের ভেতরে কেউ যেন অদৃশ্যভাবে জোরে জোরে ড্রাম বাজাচ্ছে। নাহ, আর একমুহূর্ত এখানে নয়। এখানে কিছু একটা ঠিক নেই।

সে বেরোবে বলে সবেমাত্র লকআপের দরজাটা ধরেছে, ঠিক এমন সময় কে যেন, তার পা জোড়া টেনে মাটিতে গেঁথে দিলো।

এ কী দেখেছে সে সামনে?

সে লোকটি যে এতক্ষণ গরাদের গ্রীলে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আচমকা সে দুটো হাত দিয়ে সেই গ্রিল দুটোকে দুদিকবরাবর টান মারতেই। গ্রিলটা অতি সহজেই একটা মানুষ বেরিয়ে আসার মত ফাঁক হয়ে গেলো। পার্বতী নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এতো মোটাদুটো লোহার রড, কী অবলীলায় এই রোগা লোকটা ফাঁকা করে দিলো!ঠিক যেন ওগুলো লোহার নয় রাবারের তৈরী।

ওদিকে আচমকা সেই মহিলা আবার শুরু করেছে সেই ছড়া। কিন্তু পার্বতীর সেদিকে তাকানোর সময় নেই...

সে দেখছে লোকটা প্রথমে সেই ফাঁক বরাবর মাথাটা গলিয়ে দিলো, তারপর ধীরে ধীরে শরীরটা বাইরে নিয়ে বেরিয়ে এলো। আর ঠিক তখনই পার্বতী টের পেল, লোকটির উচ্চতা আচমকাই যেন অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। শুধু উচ্চতাই নয়, ইতিমধ্যেই লোকটির দেহের গঠনের অনেককিছু বদলে গিয়েছে। হাতগুলো দুকাঁধের পাশ থেকে এতো লম্বা হয়ে ঝুলছে যে সেগুলো প্রায় মাটিতে থেকে যাওয়ার উপক্রম। মুখটাও অদ্ভুত ভাবে ছুঁচলো হয়ে উঠেছে যেন। এতটাই যে থুতনি প্রায় প্রায় ছাতি পর্যন্ত নেমে এসেছে। দু চোখ সেই আগের মতই ভয়ে বিস্ফারিত, অথচ মুখের সেই বিস্তৃত হাসি। পার্বতী টের পাচ্ছে, লোকটির গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে। ঠিক, যেন গলার ভেতরে, হাওয়া টেনে খেলা করছে সে। গরাদথেকে বেরিয়ে সে মালতী দেবীর দিকে তাকালো। আর তার দিকে তাকিয়েই, সে জিব খানা বের করে এমনভাবে ঠোঁটের ওপর চাটলো, যেন কতদিনের অভুক্ত রয়েছে সে।

পার্বতী টের পাচ্ছে, তার পেটের ভেতরটা কে যেন একটু একটু ফাঁকা করে দিচ্ছে।

সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এই মুহূর্তে যে তার সামনে রয়েছে, সে আর যাইহোক। সে কোনো মানুষ নয়। সে···ভয়ঙ্কর কিছু। আচ্ছা এই কী সেই মহিলার বলা পিশাচটা? পার্বতী কোন উপায় না পেয়ে, লকআপের গেটটা দ্রুত হাতে বন্ধ করে, বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলো। কিন্তু এতে কী কাজ দেবে?

ওদিকে প্রচণ্ড ভয়ে মালতীদেবীর গলা থেকে ছড়ার বদলে বেরিয়ে আসছে গোঙানির মত আওয়াজ। পার্বতীর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, সেই লোকটির দিকে। লোকটি ধীরপায়ে এসে দাঁড়াল ওদের লকআপের দরজার সামনে। তারপর একইভাবে মাথাটা ঠেকালো দুটো রডের মাঝে।

পার্বতীর বুকটা হাঁপরের মত ওঠানামা করছে। আচ্ছা এই ছড়াটা কী সত্যি সত্যি কাজ দেবে? নাকি... মাথা কাজ করছে না তার। আচমকাই অজান্তেই তার গলা থেকে বেরিয়ে এলো ওই ছড়া,

উলি উলি উলি

উলি বেটি ফুলি...

ফুলির পেটে ছা...

ছড়াটা শেষ হল না, তার আগেই ঘরের মেন দরজার কাছ থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো।

"হ্যান্ডস আপ!"

চমকে উঠে পার্বতী আর মালতী দেবী দেখলেন দরজার কাছে, দপদপে বাল্বের নীচে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হরিহর পিলাই। প্রৌঢ় এই ভদ্রলোককে কখনো বন্দুক উঁচিয়ে ধরতে দেখেনি পার্বতী। কিন্তু আজকে তিনি ধরেছেন। কাঁপা কাঁপা হাতে বন্দুক উঁচিয়ে তিনি তাক করে রয়েছেন সেই মানুষটির দিকে। তার ভয় পাওয়া মুখটা এতো দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পার্বতী।

"এক, পা এগোলে, গুলি করবো। হাত তোল বলছি!"

পার্বতী দেখলো আওয়াজ পেয়েই সেই অদ্ভুত মানুষটি সরাসরি ঘুরে তাকালো কনস্টেবল হরিহরের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে সামনের দিকে নুয়ে দাঁড়িয়ে, আগে পিছনে করে দুলতে লাগলো।

"কী হল? হাত তোল বলছি? শুনতে পাচ্ছিস..."

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই একটা খিলখিলে হাসির স্বর বেরিয়ে এলো লোকটির গলার ভেতর থেকে। আর ঠিক তখনই কে যেন হরিহর পিলাই এর দেহটা বাতাসে ওড়া প্লাস্টিকের মত হাওয়ায় তুলে সজোরে আছাড় মারল সিমেন্টের মেঝেতে। হাতের রাইফেলটা ছিটকে পড়েছে একপাশে।

দেহটা মেঝেতে পড়ে থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু সে কাঁপুনি কয়েকমুহূর্তের মাত্র, সাথে সাথে আবার দেহটা শূন্যে উড়ে, ছাদের সাথে ধাক্কা খেয়েই সজোরে আরেকবার মাটিতে আছড়ে পড়ল। আর আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই, একটু আগের কাঁপতে থাকা দেহটা মুখ থেকে দুই ছলক রক্ত উগরে একেবারে, নিথর হয়ে গেলো।

পার্বতীর বিস্ফারিত চোখে সবটা দেখল, কিন্তু মুখ থেকে ভয়ে আতঙ্কে একটা শব্দও বেরিয়ে এলো না। এ কী হল এক্ষুনি? হরিহরদা ওরকম চুপ করে পড়ে আছে কেন? তাহলে কী...

সেই ভয়ঙ্কর মানুষটা ওদের দিকে ফিরে ধীরে ধীরে, সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পার্বতী দেখল লোকটা ধীরে ধীরে, নিজের দুইহাত, মাথার ওপর তুলে, খানিকটা কাঁদো কাঁদো ভঙ্গীতে উপহাসের সুরে বলে উঠল, "হ্যান্ডস আপ!" আর তারপরেই জিভ বের করে হাসতে লাগলো খিক খিক করে। দপদপে আলোয় পার্বতী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, লোকটির কালো কুচকুচে লম্বা জিবখানা থেকে নাল ঝরছে ঠস ঠস করে।

ধীরে ধীরে লোকটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে ওদের গরাদের সামনে... মুখটা আবার ঠেকিয়েছে ওদের লকআপের দুটো গ্রিলের মাঝে...ঠিক আগের মত। পার্বতী জানে এরপর কী হবে? লোকটি ধীরে ধীরে গরাদের গ্রিলগুলো টেনে ফাঁক করবে... আর তারপর?

ঠিক এমন সময় কে যেন, পার্বতীর ঘাড়ের কাছে একটা গরমনিঃশ্বাস ফেলতেই চমকে উঠে পার্বতী পেছন ঘুরল। আর যা দেখল, তাতে তার মনে হল, একটা শীতলস্রোত ধীরে ধীরে তার মেরুদণ্ড বয়ে ক্রমশ, নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

মালতীদেবীর শরীরটা কখন যেন বদলে গিয়েছে আচমকাই। ঠিক ওই লোকটির মতই। শরীরটা লম্বা। হাতগুলো মাটি ছুঁয়ে ফেলছে যেন। ছুঁচালো মুখে চোখ জোড়া ভয়ে বিস্ফারিত, আর মুখে চওড়া নিঃশব্দ হাসি। ঠিক একই রকম। একই রকম একেবারে। ভয়ঙ্কর ভাবে দপদপ করছে

আলোটা... যে কোন মুহূর্তে কেটে যেতে পারে বাল্বটা। আর হলও তাই। সাথে সাথেই বাল্বটা কেটে গিয়ে গোটা ঘর ভরে উঠল প্রগাঢ় অন্ধকারে। কোনো আলো নেই। কোন শব্দ নেই। এতটাই নিস্তব্ধ চারিদিকে যে, পার্বতীর মনে হচ্ছে, সে যেন তার নিজের বুকের ধুকপুকুনিটুকুও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

আর ঠিক তখনই কে যেন তার কানের কাছে, খুব টেনে টেনে হিশহিশে স্বরে বলে উঠল, একটা ছড়া। এ ছড়া পার্বতীর আগেই শোনা, কাল মহিলাকে আনার পথেই এই ছড়া সে একাধিকবার শুনেছে। তারপর থেকে বারবার।

“উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি”

আর ঠিক এমনসময়ই, হিন্দুল পীর গ্রাম থেকে অনেক অনেক দূরে, কোন একজঙ্গলে একটা ক্ষয়প্রাপ্ত ভাঙা বাড়ির প্রায় অন্ধকার একটি কক্ষে ধড়পড় করে উঠে বসলেন এক মহিলা। ঘরের মধ্যে আলো বলতে স্যাতসেতে, চুনসরকি খসা দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাখা একটি লম্ফ, যার শিখার প্রান্তভাগের কালো ধোঁয়া, কুলুঙ্গির ছাদ খানা আঁধার করে তুলেছে। লম্ফের হলুদ আলো ঘরের ভেতরের অন্ধকার পুরোপুরি দূর করতে না পারলেও, ঘরের ভেতরকার জিনিসপত্রের অবস্থান মোটামুটিভাবে বোঝা যাচ্ছে।

ঘরের ঠিক মাঝবরাবর একটি চৌকি গোছের কিছু পাতা রয়েছে। আর ঠিক তার ওপরেই জেগে বসেছেন সেই মহিলা। অন্ধকার ঘরে, লম্ফের ঈষৎ আলো তার মুখে এসে পড়তেই চেহারাখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার। অত্যন্ত বয়স্কা একমহিলা, দেখে যার বয়সের হিসেব করা মুশকিল। হাতের নখগুলো হলদে হয়ে টুকরো টুকরো ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম। মাথায় চুলের জটাজুট। সারা শরীর আর মুখ ভর্তি, ছোট বড় নানান আকৃতির আব। সেই আবের পরিমাণ এতোই বেশি, যে সেখানে যেন তিন ধারণর জায়গা নেই।

বয়স্কা মহিলাটি নিজের বিছানায় ধড়পড় করে উঠে বসেই হাঁপাতে লাগলেন।

অন্ধকারে এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু ঘরের মেঝেতে বিচালির ওপর খেজুরপাতার চাটাই বিছিয়ে শুয়েছিল এক ন্যাড়া মাথাওলা ভদ্রলোক। মহিলাকে আচমকা জেগে উঠে অমন হাঁপাতে দেখে খানিকটা ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি চৌকির ওপর উঠে বসলো। তারপর মহিলার বুকে হাত ঘষতে ঘষতে, ভয় পাওয়া কণ্ঠে বলে উঠল, "কী হয়েছে খেমি মা? এমন হাঁপাচ্ছ কেন? ভয় পেয়েছ কিছু দেখে? কোনো স্বপ্ন দেখেছ? শান্ত হও একটু। শান্ত হও। জল খাবে? জল দেব?"

বুড়িটি লোকটির মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বলবার বদলে, একটা গোঁ গোঁ করে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো গলার ভেতর থেকে।

"কী হল? এরকম করছ কেন? জল খাবে? জল…." কথাটা বলে লোকটি আর একমুহূর্ত দেরী করলও না। সাথে সাথে ঘরের এককোণে রাখা কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে যেই পিছন ঘুরে দাঁড়ালো, সাথে সাথে চমকে উঠল ভয়ঙ্কর ভাবে। আর সেই চমকানোর চোটে স্টিলের গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ঠং করে একটা ধাতব শব্দ তৈরী হল। বুড়ি এরই মধ্যে চৌকি থেকে নেমে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। একেবারে টানটান। যেন, জ্যা বাঁধা ধনুক। লোকটির মুখ, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো। খেমি মা বয়সের ভারে, তো সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারে না। সেখানে এরকম করে...

কথাটা ভাবতে, ভাবতেই বুড়ি আচমকা ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপতে লাগলো, যেন প্রচণ্ড শীত করছে তার। ন্যাড়া লোকটি, বিছানা থেকে সাথে সাথে একটা ছেঁড়া কাঁথা তুলে, বুড়িকে ঢেকে, শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। আর ঠিক তারপরেই, গলার ভেতরের সেই গোঙানি বদলে গেলো একটা অদ্ভুত সুরে... আর তারপর বেরিয়ে এলো একটা ছড়া, যেই ছড়াটি ন্যাড়া লোকটি এর আগে কখনওই শোনেনি।

https://boierpathshala.blogspot.com

“উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি

ফুলির পেটে ছা।

ছা এর কপাল খা। “

আর ঠিক ছড়াটা আওরনোর সাথে সাথেই বুড়ির কাঁপুনিটা কেমন যেন থেমে গেলো হঠাৎ করেই। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে লোকটি ধীরে ধীরে, বুড়িকে আবার বসিয়ে দিলো চৌকির ওপর।

লোকটি হাঁ করে, বুড়ির মাটির দিকে ঝুলে পড়া মুখটির দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল খুব ধীরে ধীরে, “ও খেমি মা? এখন ঠিক আছো?”

বুড়িটি মুখে কিছু বলল না। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। সে ঠিক আছে।

“কী হয়েছিল? অমন করছিলে কেন?”

বুড়িটি এবার মুখ তুলে তাকালও ন্যাড়া লোকটির মুখের দিকে। লোকটি লম্ফের আলোয় স্পষ্ট দেখল, আব ভরা ভয়ঙ্কর মুখের মাঝে অস্থির হয়ে জ্বলজ্বল করছে বুড়ির চোখজোড়া।

“কী হয়েছে মা? এরকম অস্থির হয়ে আছো কেন?”

“পাগলা রে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। এক এমন ভয়ঙ্কর কিছুর জন্ম হয়েছে যাকে আটকানোর সাধ্যি আমাদের কারোর নেই। কারোর! সে সবকিছু ছারখার করে দেবে।”

পাগলা নামের লোকটি, ভয় পেয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, “তাহলে? কী হবে এবার? কোন উপায় নেই মা।”

facebook.com/boierpathshala.official

"নাহ, কোন উপায় নেই। থাকলেও আমি দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি না। "

"এবার? এবার কী হবে মা?"

বুড়ি তার কথার জবাব না দিয়ে লম্ফের শিখার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল।

পাগলা খেমি মা কে এত অস্থির হতে এর আগে কখনোও দেখেনি। যার কথা মা বলছে সে সত্যি সত্যি জন্ম নিলে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যেই...ঠিক এমন সময়ই পাগলার ভাবনা ছিন্ন হল একটি সুরে। পাগলা দেখল, বুড়ি সেই ছড়াটা খুব ধীর স্বরে, বিড়বিড় করে গাইছে। যেন কোনো মন্ত্র। যেন কোন আয়ুধ।

"উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি। "

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। শুধু অন্ধকার নয়। প্রচণ্ড ধোঁয়াশা। ঠিক তারই মাঝে মিলি হাতে একটা অনুজ্জ্বল এমারজেন্সির আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার আর ধোঁয়াশা ভেদ করে চোখের দৃষ্টি বেশিদূর চলে না। তাই বুঝতে পারছে না, সে ঠিক কোথায় এসে হাজির হয়েছে। এটা কী চাঁইপাট? ঠিক তাঁদের বাড়ির সামনেটা না? কিন্তু চারিদিকে এত অন্ধকার কেন? যেন পুরো পাড়া জুড়ে কে যেন একপোচ কালো রঙ লেপে দিয়েছে।

সে সামনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো। এই তো, এই তো, তাঁদের বাড়ি ঢোকার মেন দরজাটা? বন্ধ রয়েছে। মিলি একহাতে আলতো চাপ দিতেই দরজাটা একটা বিশ্রী "ক্যাঁচ" শব্দ করে খুলে গেলো। আর দরজাটা খুলে যেতেই,একটা আঁশটে গন্ধ ভক করে, মিলির নাকে এসে ধাক্কা মারল। গন্ধটা তার ভীষণ চেনা।

সে কোনোরকমে, একহাতে নাক চেপে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। ঘরের ভেতরটাও অন্ধকার। ধোঁয়া রয়েছে,তবে তা তুলনামূলক হালকা। সামনের কিছুটা এখন দৃশ্যমান। মিলি হাতের এমারজেন্সিটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। যত এগোচ্ছে সামনে,ওমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, একটা আঁশটে গন্ধ।

সিঁড়ি যেখান থেকে শুরু হচ্ছে ঠিক তার উল্টোদিকেই একতলায় ঢোকার দরজাটা। মিলি দেখলো সেই দরজাটা এখন হাট করে খোলা। মিলি অবাক চোখে সামনের দিকে এগোতে গিয়ে আচমকা থমকে গেলো। দরজার ভেতরদিকে তাঁদের ড্রইংরুম খানা। আর সেই, ড্রইং রুমের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছে,একটা চাপা আর্তনাদ। ঠিক গোঙানির আকারে।

মিলি ধীর পায়ে, মুখে কোন শব্দ না করে সামনের দিকে এগোচ্ছে। সামনে যত এগোচ্ছে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঠিক ততোই বাড়ছে গোঙানির আওয়াজটা। এমারজেন্সীর আলোয় সামনেটা আবছা আলোকিত। আর সেই আবছা আলোয় মিলি দেখল, একজন গর্ভবতী মহিলা,মাদুরের ওপর শুয়ে ছটকাচ্ছে। কে এই মহিলা? মিলি বুঝতে পারছে,মহিলার প্রসবকালীন যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্তান জন্ম নেবে। কিন্তু এত বড় গর্ভ? মিলি কোনো গর্ভবতীর এতো বড় গর্ভ এর আগে কখনও দেখেনি।

মিলি দ্রুতহাতে এমারজেন্সিটা একপাশে নামিয়ে, বলে উঠল,"তুমি কে? তোমার তো বাচ্চা হবে মনে হচ্ছে... তুমি এখানে..."

কথাটা শেষ করতে পারলো না, তার আগেই সেই গর্ভবতী মহিলা প্রচণ্ড চিৎকার করে প্রায় উঠে বসলো। আর ঠিক তখনই এমারজেন্সীর আলোটা তার মুখের ওপর পড়তেই,একমুহূর্তে পুরো শরীরটা যেন পাথর হয়ে গেল মিলির। গর্ভবতী মহিলা আর কেউ না, খোদ মিলি। হ্যাঁ,সেই শুয়ে রয়েছে তার সামনে। গর্ভবতী মিলি, বোধয় এই মিলিকে দেখতে পাচ্ছে না। এদিকে এই মিলির বোধবুদ্ধি সব যেন লোপ পেয়েছে। কী হচ্ছে এখানে? সে এখানে কী করছে?ঠিক এমন সময় আবার চিৎকার। এবারের চিৎকার, আরো

গগণবিদারী। মিলির ঘোর ভাঙতে কয়েকমুহূর্ত মাত্র সময় লাগলো, আর ঠিক তখনই সে যা দেখতে পেল, ভয়ে আতঙ্কে মেঝেতে ছিটকে পড়ল সে।

গর্ভবতী মিলির দু পায়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসছে দুটো কালো কালো হাত। রক্ত,ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। ধীরে ধীরে পুরো হাতটা বেরিয়ে আসতেই মিলির মনে হল,সে বুঝি ভয়ে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। চামড়া পুড়ে গেলে যেমন গুটিয়ে যায়,হাত দুটোও ঠিক যেন তেমন। ধীরে ধীরে, হাত। হাতের পর মাথা,মাথার পর পুরো শরীরটা... কিন্তু পুরো শরীর কোথায়। মিলি দেখছে,একটা কুচকুচে কঙ্কালসার কালো দেহ, যার সারা দেহ,চটচটে আঠালো জাতীয় রসে ভেজা, আর কিলবিল করছে সাদা সাদা পোকায়, সেই দেহের কোমরের পরে আর কিছু নেই। হ্যাঁ,কোমরের নীচ থেকে কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। জিনিসটা ধীরে ধীরে,দুহাতের ওপর ভর দিয়ে দেহটাকে তুলে ধরতেই মিলি জিনিসটার মুখটা দেখতে পেল... একটা লম্বা কালো মুখ, যার চোখ জোড়া,বড়বড়, একটা তীক্ষ্ণ নাক কিন্তু নাকের নীচে,কিছু নেই। হ্যাঁ,দাঁত, ঠোঁট, মুখ কিছু নেই। চামড়া দিয়ে কেউ যেন সিল করে দিয়েছে মুখের ওই অংশটা।

জিনিসটা এখনো মিলিকে দেখতে পায়নি। মিলি দুহাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরেছে,প্রবল আতঙ্কে। যেন আওয়াজটুকুও না বেরোয় মুখ থেকে। কিন্তু সে দেখল, ওই ভয়ঙ্কর জিনিসটা বাতাসে নাক উঁচিয়ে কীসের যেন একটা গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করছে। কীসের?মানুষের? মিলির?

এই করতে করতেই, আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে মিলির দিকে ফিরতেই,মিলির টের পেল, তার গলাটা আচমকা যেন শুকিয়ে গিয়েছে। এমারজেন্সীর আলোয় মিলি দেখল,অদ্ভুত জিনিসটার নাকের নীচের চামড়াটা ফেটে বেরিয়ে এসেছে,একঝাঁক, করাতের পাতের মত তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। একটা চওড়া হাসি।

জিনিসটা হাতের ওপর ভর দিয়েই ধীরে ধীরে মিলির দিকে এগোচ্ছে, আর যত এগোচ্ছে,ততো চওড়া হচ্ছে তার মুখের হাসি। মিলির মনে হচ্ছে তার

সারা শরীরটা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। সে নড়ছে পারছে না। উঠে দাঁড়াতে পারছে না,পালাতে পারছে না। ঠিক এমন সময় আচমকা জোর পেয়ে মিলি যেই দুহাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে যেই পিছতে যাবে,ঠিক এমন সময়ই, সেই অদ্ভুত জিনিসটা মুখে বিশ্রী একটা শব্দ করে দ্রুত হাতে প্রায় মিলির গায়ের উঠে এলো আর তখনই ধড়ফড় করে নিজের বিছানায় উঠে বসলো মিলি।

সারা শরীর ঘামে ভিজে সপসপ করছে। মিলি চারপাশে পাগলের মত তাকাতে লাগলো। ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। একটা, হালকা নীলচে নাইট বাল্বের আলো ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের আনাচে কানাচে। সেই আলোয় ফুটে উঠেছে, অনল আর মিলির বেডরুমখানা। মিলির কয়েকমুহূর্ত লাগলো স্বপ্নের ঘোর থেকে বেরিয়ে ধাতস্থ হতে।

সাদা ফুলছাপের মশারি ভেদ করে, নাইটবাল্বের নীল আলোটা বিছানায় এসে পড়ছে। ঠিক তার পাশেই শুয়ে রয়েছে মিলির শিশুকন্যা। ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্তের জন্য বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল মিলির। আর সাথে সাথেই মিলির চোখের সামনে ভেসে উঠল, আজ সকালেরই একটা দৃশ্য।

“আপনি, বিশ্বাস করুন। আমি নিজের কানে শুনেছি। “ কথাটা বলেই, মিলি তাকালো মাদুবাবার দিকে।

মদুবাবা ঘরের এককোণে ন্বুজ হয়ে কিছু একটা কাজ করছিলেন, মিলির কথা প্রায় না শোনার ভঙ্গিতে, তিনি নিজের হাতের কাজ সারতে লাগলেন। বাইরে রোদের দেখা নেই। আজ আটদিন হল, মিলির মেয়ে জন্ম নিয়েছে। সেদিনেই বেলা গড়ানোর সাথে সাথেই সূর্য মেঘের আড়ালে মুখ লোকায়। সেই থেকে আজ বিকেল পর্যন্ত চাইপাটের আকাশে আশ্চর্যজনক ভাবেই মেঘ ঝুলে রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই।

ঠিক এমন সময় ঘরের মধ্যে, সর্বমঙ্গলা প্রবেশ করে মিলিকে দেখতে পেয়েই বলে, “ওমা, তুমি কখন এলে?” মিলি সর্বমঙ্গলার দিকে তাকিয়ে

বুঝল সে জল আনতে গিয়েছিল। মাত্র ফিরেছে। তার মাথায় এখনো বাঁধা রয়েছে ব্যান্ডেজ। সে খবর নিয়েছিল, মঙ্গলাদিদি দুদিন হল ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। ওদিকে অনলের অবস্থা, স্থিতিশীল হলে, সে এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। আপাতত হাসপাতালেই রয়েছে সে। মিলি ভেবে রেখেছে, আগামীকাল নয়দিন, জন্ম অশৌচ কাটলে একেবারে দেখতে যাবে সে।

মিলি তার মঙ্গলাদির কথার জবাব দিলো না। খানিকটা হতাশার গলাতেই, মাদুবাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আমি মিথ্যে বলছি না বাবা। আমি স্পষ্ট ওই ছড়াটা শুনেছিলাম। ওটা আমার ভ্রম ছিল না। "

এই কথা শুনে হাতের কাজ থামিয়ে মাদুবাবা সরাসরি তাকালেন, মিলির দিকে।

"তার মানে তুই বলতে চাইছিস, মন্ত্রমা ভালো ছিল। সেই পিশাচকে জন্ম নেওয়া থেকে আটকানোর জন্য এসব করেছে?"

মাদুবাবার ফ্যাসফেসে স্বর ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই, মিলি কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক রইল। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, " " "বাবা, সারাক্ষণ আমার ঘরে, আমি কিছু টের পাই। কেউ যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ওই ঘরেই থাকে, ছায়ার মত। যাকে দেখতে পাই না। যার ভারী নিশ্বাসের শব্দ আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। ঘরের অন্ধকার কোণগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, কেউ যেন ওই অন্ধকারে বসে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছুর যেন অপেক্ষা করছে। মনে হয় দমবন্ধ হয়ে আসছে। আমি মেয়েকে কোলে নিতে ভয় পাই। কোনো দুধের শিশুর মুখের দিকে, তাকালে যে বুকের মধ্যে একটা দমবন্ধ করা অনুভূতি চেপে বসে আমি আগে জানতাম না। আমি ঘুমোতে পারি না বাবা। রাত হলেই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসে না। রাতের বেলা আমার সাথে ঘোষাল জেঠিমা থাকেন, তাই ভয় কম লাগে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আমার মেয়েকে ভয় পাচ্ছি। ওটুকু দুধের শিশুকে..." একটানা কথা বলে একটু থামলো মিলি, "আমার

মনে হয়, মালতী জেঠিমা সেদিন ঠিক কথা বলে ছিলেন। আমার গর্ভে হয়তো সত্যিই সত্যিই সেই পিশাচ...”

“তুমি বেশি ভাবছ মিলি। “ কলশীটা নামিয়ে, সর্বমঙ্গলা, পা পা করে এগিয়ে এলো মিলির দিকে, “সেদিনের ঘটনার রেশ এখনো তোমার মনে রয়ে গিয়েছে, তাই তোমার এখনও এরকম মনে হচ্ছে। অবশ্য তোমাকেই বা কেমন করে দোষ দিই। যা গেলো তোমার ওপর দিয়ে। আদপেই এরকম কিছু নয়, বুঝলে? হলে বাবা ঠিক টের পেতেন। মন্ত্রমার প্রকোপ শেষ হয়ে গিয়েছে। দেখবে সব ভালো হবে এখন। তুমি একটু শান্ত হও। “

মিলি দেখল, মঙ্গলা দির কথা শুনে মাদুবাবা, আবার নিজের কাজে হাত দিয়েছেন। কিছু একটা খুঁজে চলছেন, তিনি তখন ধরে। মিলি বুঝল, মাদুবাবা তার কথা হয় বিশ্বাস করছেন না। বা আগ্রহ পাচ্ছেন না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সর্বমঙ্গলার দিকে ফিরে বলে উঠল, “আমি জানি বাবা সব কিছু আগে ভাগেই টের পান। কিন্তু উনি কী এটা টের পেয়েছেন, আজ থেকে ছয়দিন আগে, হিন্দুল পীর থানায় কী হয়েছে?”

মঙ্গলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই, মিলি বিড়বিড় করে বলে উঠল, “থানায় মালতী জেঠিমা সহ এক চোর আর দুজন কনস্টেবল ছিল সেই রাতের নাইটডিউটি তে। সকালে থানায় বড়বাবু, এসে দেখেন থানা খালি, না চোর, না মালতী জেঠিমা, না সেই দুজন কনস্টেবল। কেউ ছিল না সেখানে। সেদিন থেকে তাঁদের খোঁজ চলছে, কিন্তু...”

মিলি দেখল সর্বমঙ্গলা, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অবাক হয়ে। মিলি আর দেরী না করে, ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই আচমকা পেছন থেকে মাদুবাবার, ফ্যাসফেসে গলার স্বর শুনতে পেল।

“ কাল, তোর অশৌচ কাটছে তাই তো?”

মিলি সম্মতির সুরে মাথা নাড়াল।

মাদুবাবা দেরী না করে, একটা কাপড়ের ছোট্ট থলে এগিয়ে দিলেন মিলির দিকে। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন,

"এর মধ্যে কিছু চাল আছে, আজ রাতে ভাত রান্না করার সময়, এই চালগুলো ভাতের হাঁড়িতে ফেলবি। ফ্যান গেলে, সেই ফ্যান ফেলবি না। সেই ফ্যান, একটা পাত্রে ঢেলে, বাড়ির সদর দরজার সামনে রেখে আসবি। ঠাকুরকে তুলসী দিস?"

মিলি আবার সম্মতির সুরে মাথা নাড়াতেই, মাদুবাবা বলে উঠল, "বেশ, ঠাকুরের কাছ থেকে একটা বাসী তুলসী নিয়ে, মাঝরাতের পর, সেই ফ্যানের বাটিতে ফেলবি। যদি দেখিস, ফ্যানের রঙ বদলে গিয়েছে। তাহলে সেই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি। দরকার পড়লে, সারারাত্রি, বাড়ির দরজার বাইরে কাটাবি। কিন্তু ভেতরে থাকবি না। কারণ পাত্রে তুলসী দেওয়ার সাথে সাথেই সে বুঝে যাবে, তুই সব ছল ধরে ফেলছিস... তাই খুব সাবধান। কাল অশৌচ কেটে যাবে। তারমানে তোর হাতে, আজ রাতেরই সময়। কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে কাল দুপুরের পর, মেয়েকে এখানে নিয়ে আসিস। এখন যা। "

মিলি বিছানায় বসে বসে একটা জোরে শ্বাস নিলো। মাদুবাবার কথামত সে সেই চালগুলো রান্না করে, ফ্যান গেলে, সেই ফ্যান বাটিতে করে রেখে এসেছে, বাড়ির মেন গেটের কাছে, সিঁড়ির নীচে। মিলি বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা বের করে সময় দেখল। রাত্রি, দুটো বেজে দশ মিনিট। মিলি একেবারেই শব্দ না করে ধীর হাতে মশারী তুলে বিছানা থেকে নেমে এলো। ঘরের একপাশে, মেঝেতে আরেকটা বিছানা পাতা। মশারির আড়ালে দেহটা দেখা না গেলেও, ঘোষাল জেঠিমার হালকা স্বরে, নাকডাকার আওয়াজটা টের পাওয়া যাচ্ছে। এই মহিলা সেদিনের পর থেকে রাতে, মিলির সাথেই থাকেন। অন্তত যতদিন অনল সুস্থ হয়ে না ফিরছে বাড়ি।

মিলি প্রায় কোনো শব্দ না করে, দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। ড্রইং রুমে আলো বলতে, একপাশে ঠাকুরের সিংহাসনে জ্বলতে থাকা ছোট্ট

জিরো পাওয়ারের আলোটা। মিলির বুকটা অজানা উত্তেজনায় ভয়ঙ্কর ভাবে ঢিপঢিপ করছে। সে নিজে অনেকটা নিশ্চিত নিজের মেয়ের ব্যাপারে। আজ শুধু সেই নিশ্চয়তায়, শীলমোহর পড়বে।

মিলি, খুব ধীর হাতে ঠাকুরের সিংহাসন থেকে, একটি শুকিয়ে যাওয়া তুলসীর পাতা তুলে নিতেই, টুক করে, সিংহাসনের নাইটবাল্বটা নিভে চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে, ভরে উঠল যেন। মিলি বুঝল লোডশেডিং। সে অন্ধকার হাতড়ে, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বের করে আনলো টর্চলাইটখানা। টর্চলাইটের উজ্জ্বল সাদা, বৃত্তাকার আলো, অন্ধকার ঘরের বুকচিরে, একতলার দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারল। মিলি প্রায় শব্দ না করে, দরজাটা খুলতেই, একটা কনকনে শীতল হাওয়ার স্রোত তাকে, ছুঁয়ে গেলো যেন। আর তাতেই মিলি আপাদমস্তক কেঁপে উঠল।

একতলা ও দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিং যেখানে, ঠিক তার নীচেই মিলির মুখোমুখি ওদের এই বাড়ি ঢোকার মেইন দরজাটা। মিলি টর্চের আলো ফেলে দেখল, একটা ফ্যান ভর্তি পিতলের বাটি, সেই বন্ধ দরজার সামনে পড়ে রয়েছে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে, মিলিই ওটা রেখে গিয়েছিল।

মিলি টের পাচ্ছে, কে যেন ওর বুকের ভেতরটা সজোরে, ড্রাম বাজাচ্ছে, খুব জোরে জোরে। সে খুব ধীরে ধীরে, হাঁটুমুড়ে সেই বাটিটার সামনে বসলো। তারপর, প্রায় নিঃশ্বাস আটকে, টুক করে, হাতের তুলসীপাতাটা ফেলে দিয়েই ছিটকে উঠে দাঁড়ালো। সে নিশ্চিত, ফ্যানের রঙ বদলাবেই। তার মেয়েই সেই পিশাচ, যার কথাই, মালতী জেঠিমা বলছিলেন।

কিন্তু একী? মিলি অবাক। টর্চের আলো সরাসরি গিয়ে পড়ছে, সেই ফ্যানভরা বাটির ওপর। সে দেখতে পাচ্ছে, বাটির ফ্যানের ওপর যে আস্তরণ পড়ে, তার ওপর ভাসছে তুলসী পাতাটা। কিন্তু ফ্যানের কোন রঙ পরিবর্তন হচ্ছে না। মিলির ভ্রু কুঁচকে রইল। মানে? সে যা ভাবছে তা সত্যি নয়... ওর মেয়ে বাকী আর পাঁচজনের মতই সাধারণ...কিন্তু...?

লজ্জায় তার মাটিতে, মিশে যেতে ইচ্ছে করল, এসব কী ভাবছিল ও নিজের মেয়েকে নিয়ে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!সে কেমন মা? নিজের ভ্রান্ত ধারনার জন্য ওইটুকু দুধের শিশু যার এখনো অশৌচ কাটেনি, তাকে পিশাচ ভাবতে, তার বিবেকে বাঁধল না। ছিঃ!

বেশ। যা করেছে করেছে। আর নয়, ভুল সে করেছে। তা শুধরেও সেই নেবে। যে মেয়েকে সে দূরে ঠেলে রেখেছিল এতদিন, সেই মেয়েকেই...

এসবই ভাবছিল মিলি। ঠিক এমন সময় একটা শব্দ হতেই মিলির ভাবনা থমকে গেল। তরলের ভেতর থেকে বুদবুদ ওঠার শব্দ উঠলে যেমন হয় ঠিক তেমন শব্দ। সাথে সাথেই কী মনে করে, সেই ফ্যানের বাটির দিকে তাকাতেই, মিলির মনে হল, শীতল আতঙ্কে একটা একটা করে তার ঘাড়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন।

ফ্যানের বাটির ভেতর থেকে বুদবুদ উঠছে। ঠিক জলের তলা থেকে বুদবুদ উঠলে যেমন দেখতে লাগে ঠিক তেমনই। ঠিক এমন সময় তুলসীপাতাটা টুক করে, ফ্যানের বাটির ভেতর ডুবে যেতেই, মিলির গলাটা শুকিয়ে এলো যেন। ওদিকে তুলসীপাতাটা ডুবে যেতেই বাটির ফ্যানটা ঘুরছে ধীরে ধীরে। দেখলে মনে হবে একটা অদৃশ্য হাত সেই বাটির ফ্যানটা ঘোরাচ্ছে। আর ঠিক তারপরেই, মিলি যা দেখল, তাতে প্রবল আতঙ্কে একটা চিৎকার, তার গলার কাছে এসে আটকে গেলো যেন। পলকমাত্র সময় আর সাথে সাথে বাটির, সাদা ফ্যানটা বদলে গেলো, কুচকুচে কালো রঙের তরলে...

তারমানে? তারমানে! সে যা ভাবছিল তাই ঠিক? তার মেয়েই সেই পিশাচ? মালতী জেঠিমা ঠিক কথা বলেছিলেন সেদিন? মন্ত্রমা, পেটের সন্তান চুরি করতো, যাতে, এই পিশাচ জন্ম না নিতে পারে? আর সে? আর সে কিনা এই পিশাচকেই জন্ম দিয়ে মন্ত্রমাকে শেষ করে ফেলল? এ কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ সে করে ফেলল? এবার? এবার কী হবে?

আর ঠিক তখই বিদ্যুতের ঝিলিকের মত, মাদুবাবার একটা কথা, তার মাথায় ধাক্কা মারল,

"...যদি দেখিস, ফ্যানের রঙ বদলে গিয়েছে। তাহলে সেই মুহূর্তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি। দরকার পড়লে, সারারাত্রি, বাড়ির দরজার বাইরে কাটাবি। কিন্তু ভেতরে থাকবি না। "

কথাটা মাথার মধ্যে ধাক্কা মারতেই একটা শীতল স্রোত যেন বয়ে গেলো তার মেরুদণ্ড দিয়ে। নাহ, পালাতে হবে। পালাতে হবে এই ঘর ছেড়ে। মিলি এক মুহূর্ত দেরী না করে, কালো ফ্যানের বাটিটা ডিঙিয়ে যেই দরজার ছিটকিনি খুলতে যাবে, ঠিক তখনই তার মনে পড়ল, ঘরের ভেতরে শুয়ে রয়েছেন ঘোষাল জেঠিমা। সর্বনাশ!

নাহ, জেঠিমাকে রেখে সে ঘরের বাইরে, সে কিছুতেই যাবে না। এই মহিলা তাকে, মেয়ের চেয়ে কম ভালোবাসেন না। তাই সে এনার কোনো ক্ষতি হতে দেবে না। মিলি একটা জোরে শ্বাস নিলো। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো, নিজের বেডরুমের দিকে। অন্ধকার ঘরের বুক ফালাফালা করে দিচ্ছে, হাতের টর্চলাইটের উজ্জ্বল আলো। সে দেখল, বেডরুমের দরজা, ভেজানো। সে দেরী না করে, দরজাটা খুলে ভেতরে আসতেই, সোজাসুজি, তার টর্চের আলোটা মশারি ভেদ করে তার বিছানার ওপর গিয়ে পড়ল। আর পড়তেই তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল।

মিলির মেয়ে, ওই ওটুকু বাচ্চাটা, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, নিস্পলক। শুধু তাকিয়ে নেই, ফোকলা মুখে, একটা এমন ভঙ্গী যেন সে হাসছে।

মিলি দেরী না করে, মেঝেতে পাতা, বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো, তারপর মশারী তুলে, ঘোষাল জেঠিমাকে ডাকতে গিয়েই থমকে গেলো সে,

একী? বিছানা খালি! ঘোষাল জেঠিমা কই? টর্চের আলো বিছানার ওপর পড়ছে। কিন্তু বিছানায় ঘোষাল জেঠিমার চিহ্ন নাই। একী? একটু আগেও তো তার নাকডাকার পাতলা শব্দ, মিলি শুনতে পেয়েছে। তাহলে এখন?

বাথরুমে, যাননি তো। কথাটা ভাবতে ভাবতেই, মিলি আরেকবার যেই নিজের বিছানার দিকে তাকালো সাথে সাথে ও টের পেল সেই কয়েকদিন

আগের সেই আতঙ্কের হিমশীতল অনুভূতি তার আবার ফিরে আসছে। বিছানা ফাঁকা! বিছানায় তার মেয়ে নেই। সে আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে, দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়েই বাথরুমের দিকে টর্চের আলো নিক্ষেপ করল। নাহ! বাথরুম ফাঁকা। কোথায় গেলেন জেঠিমা?

সময় যাচ্ছে, বুকের ভেতর ধুকপুকুনিটা বেড়ে চলেছে যেন।

ঠিক এমন সময় একতলার খোলা দরজার বাইরে, কিছু একটা শুনতে পেয়েই চমকে উঠল সে... সিঁড়িতে কারোর পায়ের শব্দ না?

মিলি ঘাড়ঘুরিয়ে একবার নিজের অন্ধকার ঘরের দিকে তাকালো। তারপর দ্রুত পায়ে ড্রইংরুম পার করে, একতলার দরজার কাছে পৌছালো। কিন্তু কোথায় জেঠিমা? মিলি সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে টর্চের আলোটা সোজাসুজি ওপরের দিকে মারতেই সেটা গিয়ে ধাক্কা খেলো, সিঁড়িঘরের ছাদে। বারবার তার কানে, মাদুবাবার সেই কথাগুলোই প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

"...দরকার পড়লে, সারারাত্রি, বাড়ির দরজার বাইরে কাটাবি। কিন্তু ভেতরে থাকবি না। কারণ পাত্রে তুলসী দেওয়ার সাথে সাথেই সে বুঝে যাবে, তুই সব ধরে ফেলছিস... তাই খুব সাবধান। "

"জেঠিমা? জেঠিমা···? আপনি কী উপরে গিয়েছেন? জেঠিমা?" মিলি যতটা সম্ভব চাপা স্বরে ডাকছে, কিন্তু এই রাত্রির নিস্তব্ধতায়, তার এই ডাক, যেন মনে হচ্ছে, পুরো চাইপাটের লোকজন শুনতে পাবে।

মিলি আরো দুইধাপ ওপরে উঠে, শেষ মারের মত, ডাক দেবে বলে ভাবল। "জেঠিমা? জেঠিমা? আপনি কী ওপরে? নেমে আসুন... আমাদের পালাতে হবে এই..."

কথাটা শেষ করতে পারল না মিলি, ঠিক এমন মিলির মনে হল, আবার একটা কনকনে, শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড বরাবর, একটু একটু করে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেলো যেন। মিলি টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছে, দোতলার সিঁড়ির রেলিং টপকে একটা মুখ ঠিক তার মাথা ওপর ঝুলছে। চোখ দুটো প্রচণ্ড আতঙ্কে বিস্ফারিত, অথচ মুখে চওড়া হাসি। এ কী ঘোষাল জেঠিমা? নাকি? নাকি অন্য কেউ?

"পালাতে হবে? কেন পালাতে হবে?" ঘোষাল জেঠিমার গলার আওয়াজটা কেমন সাপের মত হিশহিশে হয়ে উঠেছে। মিলির মনে পড়ল, কয়েকমাস আগে রেশমিও তার সাথে এমনই কিছু করেছিল। ঠিক এমন করেই, কেউ একজন রেশমির রূপ ধরে এসেছিল। আর সে নিশ্চিত আজকেও এসেছে। এ ঘোষাল জেঠিমা নয়। এ অন্য কেউ.. মিলি এক ধাপ যেই নিছে নেমে এলো সাথে সাথে ওপর থেকে ভেসে এলো আবার সেই কণ্ঠ।

"কী রে? বল? কেন পালাতে হবে? বল? বল? বল? বল? বল? বল?"... একনাগাড়ে বলেই যেতে লাগলো সে, "বল? বল? বল? বল?" শুধু বলতেই না, মিলি দেখতে পেল, ওই ভাবেই ঘোষাল জেঠিমার মাথাটা ধীরে ধীরে, নীচের দিকে নেমে আসছে, সিমেন্টের রেলিং বরাবর, থুতনি ঘষতে ঘষতে

মিলির মাথা ঘুরছে, তার মনে হচ্ছে, পুরো শরীরটা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারপরেও তাকে বাঁচতে হবে। পালাতে হবে। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে, সে প্রায় ছুটে প্রায় সদর দরজার কাছে এগিয়ে। দ্রুত হাতে খুলছে, সে সে ছিটকিনি। পালাতে হবে। হ্যাঁ, বাঁচতে হলে তাকে পালাতে হবে। কিন্তু শেষ ছিটকিনি খোলার সাথে সাথেই, মিলির মনে হল, কে যেন ঠিক তার কানের পেছনে খুব রিনরিনে স্বরে বলে উঠল, খুব পরিচিত ছড়ার দুটো লাইন,

"উলি উলি উলি,

উলির বেটি ফুলি..."

আর ঠিক তারপরেই একটা পেছনদিক বরাবর হ্যাঁচকাটান। ব্যাস, তারপর আর কিছু মনে রইল না।

*****

https://boierpathshala.blogspot.com

"সকালে উঠে কী দেখলি?"

মাদুবাবার মুখে প্রশ্নটা শুনেই মিলি কয়েকমুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হল, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "সকালে তন্দ্রার মধ্যেই টের পেলাম কেউ যেন ঠেলছে। অনেক কষ্টে চোখ খুলে, আমি নিজেকে ঘরের মেইন দরজার সামনে আবিষ্কার করি। দরজা দিয়ে আলো মুখে এসে পড়ছে। আর সেই আলোয় দেখতে পেলাম, যিনি ঠেলছেন, তিনি আর কেউ নন। স্বয়ং ঘোষাল জেঠিমা। "

"তারপর?"

"কোনরকমে, ধড়পড় করে উঠে বসতেই শুনতে পেলাম, ঘোষাল জেঠিমা বলছেন, মিলি মা, এখানেই শুয়েছিলি নাকি সারারাত? কী কাণ্ড দেখেছিস? দরজা দেখি খোলা, একদিনে ফ্যানের বাটি গড়াগড়ি খাচ্ছে, আরেকদিকে তুই শুয়ে আছিস? কী হয়েছিল? আর মেয়ে কই তোর...?"

"কথাটা বলেই একরকম প্রায় ছুটে তিনি ঘরের ভেতরে, চলে গেলেন। ওদিকে আমি হাঁ হয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছি, ঠিক এমন সময়ই দেখলাম, জেঠিমা বেরিয়ে আসছেন ঘরের ভেতর থেকে। আর তার কোলে ধরা রয়েছে আমার মেয়ে। তিনি যথারীতি নিজস্ব ছন্দেই আদর করছেন মেয়েকে। এদিকে মেয়েকে দেখা মাত্রই আমার গতরাত্রের সমস্ত স্মৃতি ছবির মত পরিষ্কার হয়ে উঠল। কিন্তু ঠিক তখনই, জেঠিমা এমন একটা কথা বললেন যা ওই দিনের বেলাতেও, আমায় পাথর করে তুলল। আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম জেঠিমা বলছেন, আরে, আর বলিস না। কাল বিকেলে গিয়েছিলাম একটু বোনর বাড়ি। সে কিছুতেই আসতে দেবে না। শেষমেস বাধ্য হলাম থাকতে। আসলে দীর্ঘদিন পরে গিয়েছি তো, তাই না করতে পারলাম না। লক্ষ্মীটি কাল আসতে পারলাম না বলে, রাগ করিস নি তো? ঘুমোতে অসুবিধে হয়নি? আর এখানেই বা শুয়েছিলি কেন?..."

"বিশ্বাস করুন বাবা, আমার কানে আর কোন কথা ঢুকছিল না। কাল জেঠিমা তার বোনের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানেই ছিলেন। কিন্তু আমি

facebook.com/boierpathshala.official

https://boierpathshala.blogspot.com

রাতের বেলা, একজনকে দরজা খুলে দিই। নিজস্ব, অভ্যাসে ঘরের মধ্যে বিছানা করে দিই। আর তিনি সেখানেই ঘুমোন। আসল ঘোষাল জেঠিমা যদি, ইনি হন তাহলে কাল যিনি এসেছিলেন, তিনি কে ছিলেন?“

মিলি পুরো কথাটা বলবার পর, মাদুবাবার মুখের দিকে তাকালেন। ঘরের একদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাদুবাবার শিষ্যা সর্বমঙ্গলা। মুখে দুশ্চিন্তার ঘনঘটা। ঘরের একদিকে মেঝেতে পাতা, নিজের তেল চিটচিটে বিছানার ওপর বসে রয়েছে মাদুবাবা। চোখের দৃষ্টি, তার সামনেই শায়িত, নয়দিনের মিলির কন্যার ওপর নিবন্ধ। মাদুবাবার গোটামুখটা বর্ষার মেঘের মত কালো হয়ে রয়েছে।

বাইরে ইতিমধ্যেই, একটু একটু করে সন্ধ্যার, অন্ধকার ঘনিয়েছে। মিলির এখানে আসতে একটু দেরীই হয়েছে। আজ দুপুরে নরেন জেঠু বাড়িতে নাপিত এনেছিলেন। মায়ের আর সন্তানের নখ কেটে স্নান করতে করতে অনেকটা দেরীই হয়ে গিয়েছে। তারপর, বিকেলের দিকে একটু বৃষ্টিই হল। অবশ্য মিলি বৃষ্টি মাথায় করেই বেরিয়েছিল। তাও পেছনের পথ দিয়ে। সে যে, তার মাত্র নয় দিনের মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে তা পাড়ার লোকেদের খুব একটা জানাতে চায় নি।

“কাল, যেমন যা, বলেছিলাম তাই করেছিলি? ভাতের ফ্যানের রঙটা বদলে গিয়েছিল তো?” মাদুবাবা, ফ্যসফেসে গলায় প্রশ্নটা করতেই মিলি ঘাড় নাড়াল, “হ্যাঁ। সাদা মাড় বদলে গিয়েছিল, কুচকুচে কালো রঙে। “

“বেশ। তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই। এ সেই পিশাচ, যে জন্ম নিয়েছে তোর গর্ভে। “

“এখন উপায় কী বাবা? কাল ঠিক যা যা হয়েছে, এ জিনিস, আমার সাথে হুবহু একইভাবে হয়েছে আগে। তারমানে, অনল বা আমার সঙ্গে যা যা, হয়েছিল, তা মন্ত্রমা করেনি। তা এই পিশাচই করেছিল।”

facebook.com/boierpathshala.official

"হুম, বুঝতে পেরেছি এই পিশাচ সাধারণ কেউ নয়। " মাদুবাবা, মিলির মুখের দিকে তাকালেন, "তোকে এই সন্তান ত্যাগ করতে হবে। নির্দিষ্ট উপায়ে একে মেরে ফেলা ছাড়া, আমি আর কোন উপায় দেখছি না। "

শেষের কথাটা শুনে আঁতকে উঠল মিলি, "এ আপনি কী বলছেন বাবা? মেরে ফেলতে হবে? না না!"

মাদুবাবা অবাক চোখে তাকালেন মিলির দিকে, "না, মানে...?"

"আমি আমার সন্তানকে মেরে, ফেলতে পারি না বাবা। আমার প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি এই সন্তানকে কীভাবে মারবো? অন্য কোন উপায় নিশ্চই থাকবে বাবা। নিশ্চয়ই থাকবে। আপনি সে উপায়..."

"তোর সন্তানের মধ্যে পিশাচ প্রবেশ করেনি। পিশাচ তোর সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই সেই পিশাচ, যে তোর স্বামীকে এই অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। এই সেই পিশাচ, যে চাইপাটে এতোগুলো মানুষের মৃত্যুর কারণ। এ সাধারণ কেউ নয়। এ এমনি এমনি জন্ম নেয়নি। একে যদি না মারা যায়..."

"তারপরেও বাবা। আমি একজন মা। আমি ওকে জন্ম দিয়েছি। আমি কী করে..."

"সন্তান যদি সৃষ্টির জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে...তখন এসব নিয়ম খাটে না। বিষগাছ, বিষগাছই হয়, তাকে গোঁড়া থেকেই..." মাদুবাবা মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন। মিলির দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ে চলেছে। মাদুবাবা কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "বেশ। আমি শেষ চেষ্টা করবো একে না মারার। কিন্তু আমি এখনই কথা দিতে পারছি না কীহবে? তুই একে এখানে রেখে যা। কাল সকালে এসে এর খোঁজ নিস। "

"এতো ছোট একজন, আপনি পারবেন?"

"মঙ্গলা রয়েছে, ও সামলে নেবে তুই এবার ফিরে যা...। সন্ধ্যা হয়ে এলো। মঙ্গলা, যা ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।"

মিলি মাদুবাবাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোতে যাবে ঠিক এমন সময় পেছন থেকে মাদুবাবার কথা শুনতে পেয়ে, মিলি থমকে দাঁড়ালো,

"যা, হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, না তোর আছে। না আমার। যা, হবে তা সেভাবেই মেনে নিস। শান্তি পাবি। "

******

"নেই মানে, নেই মানে কী?"

প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে উঠল, মিলি, " তুমি জানো মঙ্গলা, দিদি। তুমি কী বলছো?"

ঠিক এমন সময় ঘোষাল জেঠিমা, মিলির কাঁধে হাত রেখে বললেন, "শান্ত, হ। শান্ত হ। "

"আমায় শান্ত হতে বলছো জেঠিমা। তুমি শুনতে পাচ্ছ ও কী বলছে?" কথাটা বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল মিলি। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ঘোষাল জেঠিমারও দু চোখে জলে ধারা। মিলি যে সেদিন বাচ্চার মুখ থেকে কিছু শুনেছিল, আর তারপর যা যা কিছু ঘটছিল ওর সাথে, তা এতদিন মিলি লুকিয়ে গেলেও, কাল রাতে ফিরে সে আর কিছুই গোপন করতে পারেনি তার থেকে। পুরোটা জানতে পেরে, তিনি মিলিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, দুই হাতে। তারপর মিলির মাথায় হাত বোলাতে, বোলাতে বলেছিলেন,

"এতো ভাবিস না বউ। মাদুবাবা যখন বলেছেন, তিনি নিশ্চয়ই একটা চেষ্টা করবেন, তোর পেটেরটাকে বাঁচানোর। ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখ। কাল যখন যাবি মাদুবাবার আশ্রমে... আমায় নিয়ে যাস। আমিও যাব। "

সেই কথা মত, আজ দুটিতে ওরা সকাল সকালই হাজির হয়েছিল মাদুবাবার ডেরায়। কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করেই, ওরা থমকে গিয়েছিল। ঘরে কোথাও মাদুবাবার চিহ্ন ছিল না। আর না ছিল, মিলির সন্তানের কোন হদিস। ঘরের একপাশে মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে, বিধ্বস্ত অবস্থায় বসেছিল সর্বমঙ্গলা। মুখ দেখলে মনে হবে। ভয়ঙ্কর একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে তার ওপর দিয়ে।

ঘোষাল জেঠিমা, মিলিকে ছেড়ে এগিয়ে এলেন সর্বমঙ্গলার কাছে। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তুমি এবার বলো তো ঠিক করে? কী হয়েছে কাল?"

"মিলিকে দিয়ে ফিরে আসার পর আমি দেখি, মাদুবাবার ঘরের দরজা বন্ধ। ঘরের দরজা বন্ধের মানে হল, মাদুবাবা ধ্যানে বসেছেন। আমি তাই আর বিরক্ত করিনি। আমি বাইরেই নানান কাজ করতে থাকি। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন মাদুবাবা দরজা খোলে না, আমি তখন চিন্তায় পড়ি, রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। সব তো রয়েছে ঘরের ভেতরে...খানিকটা চিন্তা নিয়ে দরজাটা ধাক্কাতেই যাব, ঠিক এমন সময় দেখি, ঘরের দরজা খুলে যায়। আর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন মাদুবাবা। হাতে ধরা মিলির সন্তান..."

এটা বলে একমুহূর্তের জন্য থেমে ঢোক গেলে সর্বমঙ্গলা।

" আমায় কিছু বলবার সুযোগ, না দিয়েই তিনি বলে ওঠেন, মঙ্গলা। পিশাচ বিনাশের উপায় পেয়েছি। আমি যাচ্ছি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে না ফিরলে। একশো গজের পরিধির মধ্যে এই আশ্রমটা তন্ন তন্ন করে খুঁজিস।যদি দেখিস, আমি আমায় না দেখতে পেয়ে আমার কোন সামগ্রী তুই দেখতে পাস, বুঝে নিবি। আমি আর কখনওই ফিরবো না। ওই মেয়ে কাল আসলে বলিস। আমি ওর মেয়ে আর নেই। পিশাচকে শেষ করতে গিয়ে ওর মেয়েও শেষ হয়েছে। "

এতোটা কথা বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল সর্বমঙ্গলা।

"তুমি কী মাদুবাবাকে পাওনি তারপর?"

সর্বমঙ্গলা, কান্না জড়ানো কণ্ঠেই বলে উঠল, "নাহ, মদুবাবাকে পাইনি। পেয়েছি ওনার পরনের কৌপীন। " কথাটা বলেই মঙ্গলা, পিছানার উপর পড়ে থাকা, একটুকরো লাল কাপড়ের দিকে নির্দেশ করতেই ঘোষাল জেঠিমা উঠে দাঁড়ালেন। সবটা এখন জলের মত পরিষ্কার। মাদুবাবা, পিশাচ কে শেষ করতে পেরেছেন। কিন্তু তার জন্য তাকে দিতে হয়েছে অনেক বড় মূল্য।

"ও,ফুলি। একটু তাড়াতাড়ি পা চালা মা। দেখতে পাচ্ছিস? কী কালো করে মেঘ ঘনিয়েছে মাথার ওপর?"

নোনাকুরির জঙ্গলটা খুব একটা বড় নয়। আবার ঘনও নয়। ইতিমধ্যেই, ভালোই ঝোড়ো হাওয়া বওয়া সুরু হয়েছে। অন্ধকার করে আসা আকাশের তলে গাছগুলোর মাথা ঝোড়ো হাওয়ায় এমনভাবে দুলছে,যেন যে কোন মুহূর্তে মট করে ভেঙে ওদের মাথার ওপরে পড়বে। উলি প্রায় দৌড়ানোর ভঙ্গীতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর থেকে থেকেই মেয়েকে তাগাদা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওর পিছু আসার জন্য। যদিও ফুলি বুঝতে পারছে না, মায়ের এই তাড়াহুড়োর কারণটা ঠিক কী?এর আগে, যে তাঁরা ঝড় বাদলায় কোথাও যায় নি,এমন তো নয়। গতবছর এমনও হয়েছে,প্রচণ্ড বৃষ্টি ঝড়ের মধ্যেও গভীর রাত্রে মায়ের ডাক এসেছে। আর মাও তাকে নিয়ে বেরিয়েছে। কই তখন তো মাকে এতো অস্থির লাগেনি ফুলির? তাহলে আজ কেন?এর কারণ কী ফুলির বিয়ে সামনে, তাই?বুঝতে পারে না সে। মায়ের নির্দেশ মেনেই সে দ্রুত পায়ে ঘনজঙ্গলের বুকচিরে এগিয়ে যাওয়া সুরকি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে।

উলির চোখে দুশ্চিন্তার ঘনঘটা। তবে এ দুশ্চিন্তার কারণ অন্য। নিতিরামপুরের এই ডাক সে প্রথমে নিতে চায়নি। তার একমাত্র কারণ এই নোনাকুরির জঙ্গল। এই জঙ্গলে এমন কেউ রয়েছে, যার থেকে ফুলির

নিরাপদ দূরত্বটা সে সবসময় বজায় রেখে এসেছে। এক অঘোর সন্ন্যাসী। নাম মাকড়ী বাবা। বহুদিন ধরেই তার এইজঙ্গলেই বাস। এই জঙ্গলের ঠিক কোথায় তা কেউ জানে না বটে,তবে এলাকার লোকজন তাকে এই জঙ্গলেই দেখেছে বহুবার। অনেকের কথামত তার নাকি অলৌকিক নানান ক্ষমতা রয়েছে যা দিয়ে সে নাকি মানুষের নানান উপকার আর অপকার দুই করতে পারে। শীর্ণ,ছিপছিপে চেহারার সেই সন্ন্যাসীকে উলি প্রথম দেখেছিল, আজ থেকে অনেক বছর আগে। ফুলি সবে মাত্র দুদিনের তখন। সেদিন সন্ধ্যার ঠিক পরে পরেই উলির ঘোরের দোরে এসে দাঁড়িয়েছিল মাকড়ী বাবা। কুপির আলোয়,আচমকা মাকড়িবাবার সেই ছাই ভস্মমাখা, জটাজুট ধারী লম্বা পেটানো শরীর খানা দেখে প্রথমেই আঁতকে উঠেছিল উলি। কিন্তু মাকড়ীবাবা নামের সেই সন্ন্যাসী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ধীর পায়ে বিচুলির বিছানায় শায়িত সদ্যোজাত ফুলির পাশে এসে বসে। উলি দেখতে থাকে, মেয়ের মুখের ওপর মাকড়ী বাবার স্থির দৃষ্টি নিবন্ধ। কিন্তু ঠোঁট দুটো তিরিতিরি করে কাঁপছে। যেন ঠোঁটের ফাঁক গলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে, কোনো মন্ত্রধ্বনি।

হতবিহ্বল উলি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, সে দেখল মাকড়ীবাবা তার কপালে মাখা ছাই সদ্যোজাত কন্যার কপালে তিলকের আকারে এঁকে দিল।

"এ... এসব কী করছেন? কে আপনি?"

"মাকড়ী! মাকড়ী বাবা। "

মাকড়ী বাবার জলদগম্ভীর স্বর শুনে, ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল উলির। এই সেই মাকড়ী বাবা?কিন্তু এখানে কেন এসেছেন উনি? আর ফুলির কপালেই বা তিলক এঁকে দিলেন কেন?

"তোর মেয়ে," কথাটা বলেই সদ্যোজাত ফুলির দিকে ডানহাতের তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করলও মাকড়ীবাবা। তোর মেয়ে তন্ত্র সুলক্ষণা। এর গর্ভের তৃতীয় সন্তান সাধারণ কেউ হবে না। সেই সন্তান আমার চাই। "

"চাই?চাই মানে···?"

"এ মেয়ের বিয়ে দিবি না। প্রাপ্তবয়স্ক হলে একে আমি নিয়ে যাব নিজের সঙ্গে। তারপর ও আমার সঙ্গেই থাকবে। "

মাকড়ীবাবা কী বলতে চাইছে, তা ফুলির বুঝতে অসুবিধে হয় না। রাগে,ঘৃণায় সারা শরীরটা তার রি রি করে ওঠে। একাকী নারীর এ সমাজে দুর্দশার শেষ নেই তা সে জানতো। কিন্তু তাই বলে এক সদ্যোজাত শিশুর প্রতি...

আঁতুড়ের বিছানার নীচ থেকে সাথে সাথে টেনে বের করে এনেছিল ধারালো দাঁ খানা। কুপির আলোয় রাগে,ঘৃণায় লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখখানা।

"বেরো... এক্ষুনি বেরো এই ঘর থেকে। " প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে উলির শরীরখানা। "এক্ষুনি বেরিয়ে যা এই ঘর থেকে। নাহলে মাথা কেটে রেখে দেব। "

উলি দেখল, মাকড়ীবাবা ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু চোখে ভয়ের লেশমাত্র অনুপস্থিত।

"খবরদার! এরপর যদি কখনো আমি তোকে আমার বা আমার মেয়ের আশেপাশে দেখি,শেষ করে রেখে দেব একেবারে। একেবারে শেষ করে রেখে দেব। যা বেরো এখান থেকে। "

উলির কথা শুনে মাকড়ীবাবা একটা উপহাসের হাসি হাসল। তারপর সেই জলদগম্ভীর স্বরে বিড়বিড় করে বলে উঠল,

"আমি এখন চলে যাচ্ছি এই তল্লাট ছেড়ে। তবে আমি আসবো সঠিক সময়ে আসবো। আসবোই। "

সেদিনের পর দীর্ঘবছর কেটে গিয়েছে এলাকায় মাকড়ীবাবাকে আর দেখা যায়নি। সবাই প্রায় মাকড়ীবাবাকে ভুলতেই বসেছিল ঠিক এমন সময় আজ

থেকে তিনদিন আগে,সন্ধ্যার মুখে, একটা ঘটনা ঘটল যা উলির বুকের ভেতর সেই পুরনো ভয়টা আবার জাঁকিয়ে বসিয়ে দিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় উঠোনের একপাশ থেকে মেয়ের আর্তনাদ। চমকে উঠল উলি। চমকে উঠেই উলি কুপির আলো হাতে নিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল, তুলসীমঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে ভয়ে কাঁপছে ফুলি। সন্ধ্যাবাতী দিতে বেরিয়েছিল সে। সেই প্রদীপখানাও একপাশে উল্টে পড়ে রয়েছে।

"কী হয়েছে? এরকম করছিস কেন?"

আর ঠিক তখনই তার নজরে পড়ল ফুলির ঠিক দুটো ভ্রুর মাঝে একটা ছাইভস্মের তিলক। সেই তিলক দেখার পর একটা ঠাণ্ডা শীতল স্রোত যেন বয়ে গেলো তার মেরুদণ্ড দিয়ে।

"একটা লোক,। লম্বা, কালো। সন্ন্যাসীর মত বেশ। আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে মুখের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি কিছু বলবার আগেই নিজের কপাল থেকে ঘসে কী একটা আমার মাথায় লাগিয়ে দিলো। আমি... আমি কিছু বলবার আগেই..."

উলির আর বোঝার কিছুই বাকী রইল না। সে বুঝতে পেরেছে, মাকড়ীবাবা ফিরে এসেছে। তার জিনিস নিতে। না, সে সেটা হতে দেবে না কিছুতেই।

"ও কেউ নয়। চোর হবে কোনো। তুই... তুই ঘরে যা। "

উলি মেয়ের কাছে কথাটা লুকিয়ে ফেললেও সে কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট ভয়ে ভয়েই রইল। তারপর থেকে তিনদিন হয়েছে, কিন্তু তার সবসময় মনে হয়েছে,একজোড়া চোখ বুঝি, তাকে আর ফুলিকে সব সময় আড়াল থেকে লক্ষ্য রেখে চলেছে। তাঁদের গতবিধি, তাঁদের চালচলন। ওদিকে ফুলির বিয়ের দিনও আগত প্রায়। মেয়ের এই বিয়েটা সে অনেক ভেবেচিন্তেই ঠিক করেছে। ফুলির হবু স্বামী লোকনাথ পেশায় কবিরাজ। তিনকুলে তার তেমন কেউ নেই। বিয়ের পর ঘরজামাই হিসেবে সে এখানেই থাকবে। এবার

ভালোয় ভালোয় বিয়েটা মিটে গেলেই হয়। উলি সব সময় ঈশ্বরকে ডেকে এসেছে, এর মাঝে যেন কোন বিপত্তি না ঘটে। কিন্তু তারপরেও আজকের এই দুর্যোগপূর্ণ সময় তাঁরা মা মেয়ে এই নোনাকুরির জঙ্গলে।

উলি এইসব ভাবনায় প্রায় অন্যমনস্ক হয়েছিল। তাই সে ঠিক খেয়াল করেনি। কিন্তু আচমকা পেছেন থেকে, ফুলির একটা ভয়ার্ত চিৎকার শুনে,চমকে উঠে পেছন ঘুরে তাকাতেই উলি দেখল, তার মেয়ে ঠিক তার পেছনের দিক নির্দেশ করছে। চমকে উঠে উলি পেছন ঘুরে দেখল। আর দেখবার সাথে সাথেই একটা অজানা আতঙ্কে উলির মনে হল, তার পেটের ভেতরটা একটু একটু করে খালি হয়ে যাচ্ছে। সে দেখল, তার থেকে ঠিক হাত দশেক সামনে সুরকি পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা লম্বা কালো মিশমিশে শরীর।সারা অঙ্গে ছাই ভস্ম। কোমরে ল্যাঙটের আকারে ধারণ করা মলিন লাল বস্ত্র। মাথায় কাঁচা পাকা জটাজুট প্রচণ্ড ঝোড়ো হওয়ায় এলোমেলো হয়ে পড়ছে। এ আর অন্য কেউ নয়। মাকড়িবাবা। সেই রাত্রের মুখখানা আজও স্পষ্ট মনে রয়েছে উলির। শুধু সেদিনের যে চোখজোড়া লোভে চকচক করছিল সেদিন আজ সেই চোখে প্রচণ্ড আক্রোশ। যেন দুই চোখ দিয়ে গিলে খেয়ে ফেলবে সে উলিকে।

উলি দেখল, মাকড়িবাবা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তার নিজের শরীরে যেন সাড় নেই। কোন এক অজানা মন্ত্রমোহী বশীকরণে তার পুরো শরীরটা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে গিয়েছে।

মাকড়িবাবা প্রচণ্ড আক্রোশে,উলির চুল ধরে একটা সজোরে হ্যাঁচকা টান মারতেই উলি মাটির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর সাথে সাথে মাকড়িবাবা, তার ভারী শক্ত পা খানা উলির গলায় চেপে,চিৎকার করে উঠল প্রচণ্ড আক্রোশে,

"তুই মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিস? তোকে বলেছিলাম,ও মেয়ে আমার। ওর গর্ভের তৃতীয় সন্তান আমার চাই। তারপরেও... তোর এতো সাহস? তোর এতো স্পর্ধা?"

উলি টের পাচ্ছে গলার ওপরে মাকড়িবাবার পা খানা চেপে বসছে একটু একটু করে। তার দম নিতে অসুবিধে হচ্ছে।দুহাত দিয়ে প্রাণপণে সে সন্ন্যাসীর পাখানা সরানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে কই? একটু একটু করে, চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসছে তার... আচ্ছা সে কী এভাবেই এই জঙ্গলের মধ্যে এইভাবে মরবে, আর এই মাকড়িবাবা তার মেয়েকে...কথাটা ভাবতে পারল না, তার আগেই একটা ঠক করে ভোঁতা আওয়াজ। আর সাথে সাথে একটা চাপা আর্তনাদ। উলি দেখল, পায়ের ভার শিথিল হয়ে মাকড়ীবাবার শরীর খানা আগাছা ভর্তি মাটির ওপর পড়তেই ধপ করে একটা ভারী শব্দ হল।

উলি ধড়পড় করে কোনভাবে উঠে দেখল, একদিকে ফুলি দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর তার হাতে ধরা রয়েছে একখান সদ্য ঝড়ে ভেঙে পড়া শক্ত পেয়ারা গাছের ডাল। ফুলি ও দিয়েই, মাকড়িবাবার মাথার পেছনে আঘাত করেছে। আর সেই আঘাতেই মাকড়িবাবা অচৈতন্য। ফুলি হাতের ডালখানা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে নিজের মাকে, জড়িয়ে ধরল।

“মা... মা। তুমি ঠিক আছো?”

উলি গলার কাছে হাত রেখে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। তবে আরেকটু হলেই...

“ও? ও কে মা? ও কেন তোমায় মারতে চাইছিল? আর আমায় নিয়ে কীসব বলছিল?”

“চুপ! এখানে আর একটাও কথা নয়। বাড়ি ফিরে সব বলছি। সব...। চল, আগে পালাতে হবে। “ কথাটা শেষ করেই আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করল না উলি। একপ্রকার মেয়েকে টানতে টানতে সুরকি পথ ধরে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ির দিকে পা বাড়াল। নাহ, আর অপেক্ষা নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফুলির বিয়েটা দিতে হবে। দিতেই হবে।

****

চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্ধ্যা কটা হবে? সাতটা বোধকরি।

একহাতে হ্যারিকেনের আলো আর অন্যহাতে একটা কোদাল নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে সর্বমঙ্গলা। সেইদিনের ঘটনার পর আজ তিনদিন হয়ে গেলো। এর মধ্যে মিলি রোজ একবার করে এসেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাকে নিরাশ মুখে ফিরতে হয়েছ মাদুবাবার ডেরা থেকে। মিলির এই প্রত্যেকবার ফিরে যাওয়ার নিরাশ চেহারা সর্বমঙ্গলার বুকের ভেতরটা আরো বেশি করে মুচড়ে দেয়। কিন্তু সে অপারগ। এই তিনদিনে,সর্বমঙ্গলা প্রায় নাওয়া, খাওয়া ভুলেছে। চেহারা হয়েছে মলিন।গাল বসেছে,চোখ জোড়া না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, প্রায় কোটরে ঢুকে পড়েছে। বেশভূষা হয়েছে উলোঝুলো পাগলের মত। বলা যেতে পারে, পূর্বের সর্বমঙ্গলার সঙ্গে এই সর্বমঙ্গলার যেন কোন মিল নেই।

মিলি অনেকক্ষণ বসেছিল, মাদুবাবার ডেরায়। চুপচাপই বসেছিল। এই তিনদিনে তারও অবস্থা হয়েছে করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর, তারপর সে যখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে,সর্বমঙ্গলার কী যে মনে হল, মিলিকে পেছন থেকে আচমকা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। মিলি অবাক চোখে তার কান্নারত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, একটা মলিন হাসি হাসল। তারপর খুব ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সর্বমঙ্গলা চোখের জলমুছে, আবার ঘরের এককোণে গিয়ে বসে পড়ল। আজ তৃতীয়দিন। সন্ধ্যার অন্ধকার আরেকটু ঘন হলে তাকে বেরোতে হবে নিজের কাজে।

সরু সুরকি পথে চলতে চলতে আচমকা পেছন থেকে মচ করে একটা শব্দ হতেই চমকে পেছন ঘুরল সর্বমঙ্গলা। সাথে সাথে হ্যারিকেনের আলো উঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করল, কেউ তার পিছু নিয়েছে নাকি? নাহ, কেউ নেই। অবশ্য কেইবা তার পিছু নেবে? কিন্তু সে যে ওই বিসদৃশ শব্দটা শুনলো? ঠিক এমন সময় একজোড়া চোখ ঠিক তার পেছনেই জ্বলজ্বল করে উঠতে,সর্বমঙ্গলা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একটা শেয়াল!

সে এবার দ্রুত পা বাড়াল জঙ্গলের পথে। এখনো বেশ কিছুটা পথ তাকে যেতে হবে। সেদিন সে মিলি আর ঘোষাল জেঠিমাকে সত্যি কথা বলেনি। সেদিনের ঘটনাটা অন্যরকম হয়েছিল। কথাটা ভাবতে ভাবতেই তার চোখের সামনে সেদিনের দৃশ্যটা সিনেমার মত ফুটে উঠল,

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষার পর মঙ্গলা দরজাটা ধাক্কা দিতেই যাবে, ঠিক এমন সময় দরজাটা ভেতর থেকে খুলে গেলো। মাদুবাবা বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। চোখ মুখ,অন্যরকম লাগছে তার।সর্বমঙ্গলা দেখল,মাদুবাবা হাতে ধরে রয়েছেন মিলির সেই সন্তানকে।

"কী হয়েছে বাবা? কিছু বলবেন?"

"যেতে হবে এক জায়গায়। তুইও যাবি। কোদাল আর হ্যারিকেনটা নিয়ে আয় আমার সঙ্গে।"

মাদুবাবার ফ্যাসফেসে, স্বর বাতাসে ছড়িয়ে পড়তেই,মঙ্গলা কয়েকমুহূর্ত বাবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বাবার নির্দেশ মেনে, কোদাল আর হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে জঙ্গলের পথে তাঁর পিছু নিলো। অনেকটা পথ এইভাবে আসার পরে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, মাদুবাবা থেমে গেলেন। জায়গাটা জঙ্গলের মধ্যে হলেও, কিছুটা ফাঁকা। সর্বমঙ্গলা কাঠকুড়তে কখনো জঙ্গলের এদিকটায় আসেনি। চারপাশে নজর বুলিয়ে মঙ্গলা বুঝল, জঙ্গলের মাঝে এটা একটা অগভীর টুবির মত। বর্ষাকালে জায়গাটা জল জমে, পুকুরের আকারে পরিণত হয়। নইলে অন্যসময় শুকনোই থাকে। মাদুমামা, মঙ্গলাকে শুকনো জমিরই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত খুঁড়তে নির্দেশ দিলেন। মঙ্গলা গুরুর নির্দেশ মেনে গর্ত খুঁড়তে লাগলো। প্রায় ঘণ্টা, দুয়েক পরে একটা চারহাত বাই চারহাতের গভীর গর্ত যখন খোঁড়া হল তখন মঙ্গলা,খুঁড়ে তোলা, মাটির ঢিপির ওপর বসে কুকুরের মত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। এতোটা কাজ, তাও একটানা করবার অভ্যাস একেবারেই নেই তার।

"শোন,মঙ্গলা। আমি কোনো উপায় পাইনি, এ সন্তান বাঁচানোর। খোদ পিশাচকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আর আমি তার কারণও দেখি না। ওকে মরতেই হবে। " মাদুবাবার, ফ্যাসফেঁসে স্বর ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের বাতাসে। মঙ্গলা অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে মাদুবাবার দিকে।

"কিন্তু পিশাচকে তো এমনি এমনি মারা যাবে না। আপাতত, মন্ত্রবন্ধকী দিয়ে এর ইন্দ্রিয়বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই এর সাথে কী হতে চলেছে, সেটা এখনো বুঝতে না পারলেও,একটা সময় বুঝতে পারবে, যখন একে, মারা হবে। তাই তখন সে,সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে নিজেকে বাঁচানোর। সেই সময় ওকে বেঁধে রাখার জন্য, এমন একজনকে,ওর সাথে মরতে হবে, যার অখণ্ডবন্ধন মুক্ত করার ক্ষমতা ওর নাই। আর তাই..."

ভয়ে কেঁপে উঠে দাঁড়ালো মঙ্গলা। কী বলতে চাইছেন মাদুবাবা?

"আর তাই, আমায় মরতে হবে। আমাকে এই শিশুটির সঙ্গে তুই কবর দিবি। "

"নাহ!" আর্তনাদ করে উঠল, মঙ্গলা।

"আর কোন উপায় নেই, মঙ্গলা। এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এটা তোকে করতেই হবে। "

"কিন্তু বাবা, আমি কীভাবে?"

"পারবি মঙ্গলা। তুইই পারবি। "

"কিন্তু মিলি আসলে, ওকে কী বলবো?সবাই কে কী বলবো?" মঙ্গলার মাথা কাজ করছে না। সে কিছু ভাবতে পারছে না। বুঝতে পারছে না।

" সত্যিটা বলবার দরকার নেই ।ওকে নিজের মত করে কিছু গল্প বলিস। কিন্তু এটা অবশ্যই বলিস, যে আমি পিশাচ কে শেষ করে ফেলেছি। এতে হয়তো ও শান্তি পাবে। "

মঙ্গলার চোখ ঝপাসা হয়ে উঠল অচিরেই, “বাবা, তোমায় কী আর কখনওই পাবো না?”

সর্বমঙ্গলার কথা শুনে, মাদুবাবা কয়েক মুহূর্ত তাকালেন,ওর দিকে, তারপর বিড়বিড় করে বললেন,“ আজ থেকে ঠিক তিনরাত্রি পর। ই জায়গায় এসে, এই কবর তোকে আবার খুঁড়তে হবে। যদি আমার ফেরার, হয় আমি সেদিনই ফিরবো। “

কথাটা বলতে বলতে কাঁপা কাঁপা পায়ে, মাদুবাবা মিলির মেয়েকে বুকে নিয়ে সেই গর্তের ভেতরে নেমে দাঁড়ালেন। “শোন, আমি চোখ বন্ধ করবার সাথে সাথেই,যত দ্রুত সম্ভব মাটি ফেলবি। চেষ্টা করবি যাতে খুব দ্রুত মাটি চাপা দেওয়া যায়। “

মাদুবাবা আর দেরী না করে দ্রুত বসে পড়লেন সেই গর্তের মধ্যে, তারপর মিলির মেয়ের দুই চোখ , একহাত দিয়ে ঢেকে শুয়ে পড়লেন গর্তের মধ্য। মাদুবাবা শেষবারের মত, একবার তাকালেন,সর্বমঙ্গলার দিকে। তারপর যেই চোখ বন্ধ করলেন, সাথে সাথে,মঙ্গলা মাটি ফেলতে লাগলো, সেই গর্তের মধ্যে। দ্রুত হাতে কোদাল চালাচ্ছে সে। ফেলছে,ফেলছে , ফেলছে। দেখতে দেখতে,কিছু সময়ের মধ্যেই, গর্তে, পুরো মাটিটা ভরে উঠতেই কোদালটা একপাশে ছুঁড়ে, সদ্য বুজিয়ে ফেলা কবরের ওপর, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মঙ্গলা। আর তারপরেই মঙ্গলার বুক চিরে বেরিয়ে এলো একটা হৃদয় নিংড়ানো কান্নার আওয়াজ। মহাগুরুনিপাতের শোক কী কম?

দৃশ্যটা দ্রুত চোখের সামনে থেকে সরে গেল মঙ্গলার। ইতিমধ্যেই সে হাঁটতে হাঁটতে, সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে সেদিন সে মাদুবাবা আর সেই পিশাচটিকে কবর দিয়েছিল। অন্ধকার বনে,হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেলো, সেদিন সে,যেভাবে মাটি চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল, আজ জায়গাটা ঠিক একইভাবে রয়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ এখানে এসে, মঙ্গলার কেমন একটা যেন অস্বস্তি হতে লাগলো। তার বারবার মনে হতে লাগলো, বাতাসটা কেমন যেন ভারী হয়ে রয়েছে। ভারী বাতাস তো ভালো

কিছুর সঙ্কেত বহন করে না। তাহলে? মাদুবাবা বলেছিলেন, পিশাচের বিনাশ ঘটবে,সেদিনই । কিন্তু মঙ্গলার কেন মনে হচ্ছে, কিছু একটা খারাপ হতে চলেছে। কিন্তু পরক্ষনেই নিজেকে প্রবোধ দিলো সে মনে মনে। এসব হয়তো,সেদিনের ঘটনার জন্য। যতই হোক, দুটো প্রাণকে জীবন্ত কবর দিয়েছে সে নিজের হাতে। তার একটা প্রভাব তো থাকবেই।

মঙ্গলা,একপাশে হ্যারিকেনটা নামিয়ে রেখে দ্রুত হাতে কবর খুঁড়তে লাগলো। বেশকিছুটা খুঁড়ছে,হাঁপাচ্ছে, দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে। আবার খুঁড়ছে,এই করতে করতে, যখন বেশ কিছুটা মাটি খোঁড়া হয়ে গেলো,ঠিক তখনই ই কোদালটা, অন্যরকম কিছুতে স্পর্শ পেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মঙ্গলা। মানুষ মরলে, কবর দিলে তো মাংসপচা গন্ধ ছাড়বে। কিন্তু এতক্ষণেও তো ছাড়ল না?

বুকের ভেতরে আচমকাই একটা চাপা উত্তেজনা টের পেল মঙ্গলা। তারমানে,বাবা! বাবা বেঁচে আছেন? আর তখনই পায়ের ঠিক নীচেই কিছু যেন একটা নড়ে উঠল। এই তো,এই তো পায়ের নীচে কী একটা নড়ছে যেন, গর্তের ভেতরটা অন্ধকার, দেখা যাচ্ছে না,ঠিক করে। আচমকা মঙ্গলা আঁতকে উঠল, একটা ঠাণ্ডা হাত তার ডান পা খানা সজোরে চেপে ধরেছে, অন্ধকার গর্তের মধ্যেই... হ্যারিকেনটা দরকার,কথাটা বলতে বলতেই, সে কোদালটা গর্তের বাইরে,ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনটা ধরতে গিয়েই মাথার ওপর আচমকা একটা বিদ্যুতের ঝিলিক, আর তারপরেই কড়াৎ করে একটা প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়বার শব্দ। আর সাথে সাথে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। কেঁপে উঠল মঙ্গলা। হ্যারিকেনটা হাতের আয়ত্তে চলে এসেছে। ওদিকে,গর্তের ভেতর থেকে, একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ।

“হ্যাঁ,বাবা। হ্যাঁ,এই যে। এই তো বের করছি আপনাকে...” কথাটা বলেই হ্যারিকেনটা নিয়ে সাথে সাথে যেই পেছন ঘুরল মঙ্গলা, তার মনে হল,একটা প্রবল আতঙ্ক, মুহূর্তের মধ্যেই পাথর করে দিয়েছে তাকে। ছোট

ছোট সাদা পোকায় কিলবিল করছে, একটা কঙ্কালসার কালো কুচকুচে দেহ,যার কোমর থেকে নীচের অংশ অনুপস্থিত, যে নিজের দেহটাকে একহাতে ভর দিয়ে তুলে রেখেছে মাটির ওপরে, অন্য একটা হাত মঙ্গলার ডান পায়ে আঁকড়ে ধরা। হ্যারিকেনের আলোয় মঙ্গলা দেখল, বড় বড় বিস্ফারিত চোখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটা মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর সেই চওড়া হাসির মাঝে করাতের পাতের মত সাদা দাঁত, আর লকলকে কালো জিভ বারবার সে বের করে, বাতাসে কীসের যেন স্বাদ নিচ্ছে।

মঙ্গলা,প্রবল আতঙ্কে, শ্বাস নিতে ভুলে যাচ্ছে। এ কাকে দেখেছে সে?এ কী জিনিস? আচমকা জিনিসটার কপালের মাঝবরাবর একটা চিড়ফাট তৈরী হল। মঙ্গলা দেখল, সেই ফাট ক্রমশ চওড়া হতেই মাথাটা মাঝামঝি বরাবর অর্ধেক ভাগ হয়ে দুদিকে ঝুলে পড়ল, আর আর সাথে সাথে সেই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলো একজোড়া কালো হাত।

আর ঠিক তখনই শুরু হল বৃষ্টি। হ্যাঁ,মুষলধারে বৃষ্টি। আচমকা,আর আতর্কিতে। আর বৃষ্টির ঠাণ্ডা জল, হ্যারিকেনের গরম কাছের ওপর পড়তেই। মুহূর্তে কাঁচ ফেটে চৌচির। আর সাথে সাথে একটা দমকা হাওয়া, হ্যারিকেনের আলোটা দপ করে নিভিয়ে দিতেই ছাইদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গেলো। আর তার পরপরই একটা প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের কোণে কোণে।

******

“ঘরের ভেতর থেকে চুরি হয়েছে? Are you f*cking creazy? এসব কী যা তা বলছেন আপনি? মিলি? উনি কী বলছেন?”

ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে অনল প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে উঠল।

ঘোষাল জেঠিমা আড়চোখে একবার তাকালেন মিলির দিকে। ড্রইং রুমের একপাশে মাথা নীচুকরে, থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে মিলি। অনল সেদিনের পর আজ বাড়ি এসেছে। মিলিই হাসপাতালে আনতে গিয়েছিল অনলকে।

অনলের অফিস কলিগেরা অবশ্য বলেছিল, মিলির আসার দরকার নেই। তাঁরাই গাড়ি করে অনলকে, বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবে। কিন্তু মিলি রাজী হয়নি। অগ্যতা, তাঁরা একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে, যে যার বাড়ি ফিরেছে। মিলি সেই গাড়িতে করে, মাত্র কিছুক্ষণ আগেই অনলকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে। আর ঢোকার সাথে সাথেই সে নিজের মেয়ের খোঁজ করেছে।

ঘোষাল জেঠিমা, মিলিকে আগেই সাবধান করেছিলেন। অনলকে আসল সত্যিটা বলবার কোন দরকার নেই। বরং তার বদলে, বাচ্চা চুরি গিয়েছে এমন কিছু বলে দেবে। অবশ্য তার জন্য অনেক ব্যবস্থাই করতে হয়েছে। মিলি আর ঘোষাল জেঠিমা দীর্ঘ আলোচনা করে সেই প্ল্যান ও করেছে। যেদিন,মিলি নিজের মেয়েকে মাদুবাবার আশ্রমে রেখে আসে, সেদিন মনে করে ফেরার সময়, একটি কাপড়ের পুঁটলিকে এমন ভাবে ধরে পাড়ায় ঢোকে, যেন সে তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। ফলত,কারোর কাছে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এরপর তাঁরা হিন্দুল পীর থানায় গিয়েছে শিশু মিসিং হওয়ার ডায়রি করতে। থানার অবস্থা এখনো খারাপ। কোন নতুন কনস্টেবল, নিযুক্ত হয়নি। ফলত পুরো ব্যাপারটা,বড়বাবু আর মেজবাবুই সামলাচ্ছেন কোনঅকম জোড়াতাপ্পি দিয়ে। এরমধ্যে গতকাল,মেজবাবু, গুণাকর চক্রবর্তী এসে,জেনারেল কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ও চারপাশ দেখেশুনে গিয়েছেন। কিছুদিন আগেই অবশ্য তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন, মালতী জেঠিমা কে নিয়ে যেতে। তাই এই বাড়ি তার চেনা।

পুলিশ অবশ্য সন্দেহ করছেন,ওই ফেরার মালতী জেঠিমাই নাকি বাচ্চাচুরির ঘটনায় দায়ী।

"বাবা, সব বলছি। তুমি একটু শান্ত হও। এই সবে এতো বড় অসুস্থতা নিয়ে ফিরলে। একটু শান্ত..."

"আপনি চুপ করুন। "ঘোষাল গিন্নিকে,মাঝপথেই থামিয়ে অনল মিলির উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "মিলি,উত্তর দাও। উনি যা বলছেন তা, সত্যি? আমাদের বাচ্চা চুরি গিয়েছে?"

মিলি কোন রকমে, সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ালো। হ্যাঁ সত্যি!

অনল,মিলির কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে উঠল, "এটা তুমি কী করলে মিলি? কী করলে? আমি তোমায় আসার পথে,হাজারবার জিজ্ঞাসা করেছি, নিজের মেয়ের ব্যাপারে,তুমি নিরুত্তর থেকেছো। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে, তোমার ওপরে। এ তুমি কী করলে মিলি…"

অনল টের পাচ্ছে, একটা কন্নার দমক ঠেলে বেরিয়ে আসছে,তার গলা চিরে। কোনরকমে সে সেই কান্না গিলে দাঁতে দাঁত চিপে বলে উঠল, "যে মা, নিজের সন্তান কে হারিয়ে ফেলে, সে কখনওই ভালো মা নয় মিলি। এটা তুমি দ্বিতীয়বার প্রমাণ করলে। প্রমাণ করলে…"

অনলের এই কথা শুনে, মিলি শূন্য চোখে তাকালো অনলের দিকে। এ কী বলে ফেলল অনল?মিলির মনে হল, তার পায়ের তলায় যেন আর মাটি নেই আর।

অনল মিলিকে ছেড়ে, একবার ঘোষাল জেঠিমার দিকে তাকাল। তারপর,ধীর পায়ে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলো। ওদিকে, পাড়ায় রীতিমত সন্ধ্যাবাতি দেওয়ার শঙ্খধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। ঘোষাল জেঠিমা, ধীরপায়ে মিলির কাছে এসে, তার কাঁধে হাত রাখলেন,

"ওর কথায় কিছু মনে করিস না বউ। সন্তান হারিয়েছ এক বাবা। তার কষ্টটাও তুই বোঝ!"

আর আমি? আমি সন্তান হারাইনি। নাকি অনলের মত তোমা র মনে হয়, আমি ভালো মা নই?"

ধুস বোকা মেয়ে। এতো বড় ঘটনা ঘটল, তার কিছু তো প্রভাব থাকবে। যা,এবার বরের চা, জলখাবার ওষুধের ব্যবস্থা কর। আমি যাই,ওদিকে গিয়ে দেখি বাড়িতে…"

কথাটা শেষ হল না ঠিক এমন সময় বেডরুমের ভেতর থেকে অনলের চিৎকার শোনা গেলো। সেই চিৎকারে,বিস্ময় এর সঙ্গে সঙ্গে, ছিল একটা

প্রচণ্ড আনন্দ। মিলি আর ঘোষাল জেঠিমা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে, কী হল এমনটা ভাবছেন,ঠিক সেই সময়, বেড রুমের দরজায় দেখা গেলো অনলকে। তার সারা চোখে মুখে,একই সঙ্গে আনন্দ, উল্লাস আর চরম বিরক্তির মিশ্র অনুভূতি।

"ছিঃ! মিলি, এইভাবে আমায় ঠকালে? নিজের সন্তানকে, নিয়ে এইভাবে কেউ বিশ্রী রসিকতা করে?তাও আবার আমি যখন আজ সবে মাত্র বাড়ি ফিরেছি..."

তারপর সে ঘোষাল গিন্নির দিকে, ফিরে বললেন,"আর আপনিও? মিলির নইলে বয়স কম?ও কম বোঝে? কিন্তু আপনি?আপনার থেকে এই ধরনের আচরণ একদম এক্সপেক্ট করিনি। " অনলের চোখে মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি। সে আর মুহূর্ত কাল অপেক্ষা না করে, আবার বেডরুমের ভেতরে অদৃশ্য হল, আর তারপরেই,ভেতর থেকে অনলর গলা ভেসে এলো। কাকে যেন আদর করছে সে ঘরের ভেতরে। মিলি আর ঘোষাল জেঠিমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে অজান্তেই। পা পা করে, দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন ওড়া দুজনেই, কিন্তু চৌকাঠের কাছে,পৌঁছানোর আগেই কে যেন, তাঁদের পা জোড়া টেনে,মাটির মধ্যে টেনে গেঁথে দিলো। ওরা, এখান থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে,ঘরের ভেতরে, খাটের অপর আধশোয়া হয়ে,অনল আদর করছে, একটা বাচ্চাকে। আচমকা বাচ্চাটি ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অপলক দৃষ্টিতে ওদের শূন্য হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে দিলো। আর এইবাচ্চাটা আর কেউ না। স্বয়ং,মিলির মেয়ে। যাকে মঙ্গলাদির কথা মত, মাদুবাবা,শেষ করে ফেলেছিলেন। সে ফিরে এসেছে।

****

চিলে কোঠার ঘরে দাঁড়িয়ে, ছাদের দরজায় তালা লাগাচ্ছিল অনামিকা। রাত্রি কটা হবে?নটা? কিন্তু এরই মধ্যে সারা এলাকা জুড়ে ঝুম অন্ধকার। আর হবে নাই বা কেন? যবে থেকে এই ঘাটের মড়া,বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ওমনি সন্ধ্যা নামলে,সেই যে লোডশেডিং শুরু হবে, শেষ হবে, সেই গভীর রাত্রে।

সারা সন্ধ্যা এই হ্যারিকেন, আর এমারজেন্সির আলোতেই কেটে যাচ্ছে এই কদিন। ইলেকট্রিক অফিসেও খবর দিয়ে কোন লাভ হয়নি। আজ সারা বিকেল শুনেছিল, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ইলেকট্রিক পোলগুলোতে কীসব কাজ হচ্ছিলো। ভেবেছিল, এইবার বুঝি,সুরাহা হবে। কিন্তু কোথায় কী? সারাদিনের কাজপত্র সেরে,সন্ধ্যার সময় যে একটু টিভিতে দুচারটে সিরিয়াল দেখবে, সে উপায় কী আর রয়েছে?

নিজের মনেই খানিকটা বিরক্তিতে গজগজ করতে লাগলো অনামিকা। মিত্রদের বাড়ীটা সুভাসপল্লীর ঠিক মাঝবরাবর। কয়েকদিন আগেও সারা পাড়া জুড়ে মন্ত্রমার যা তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। ভেবছিল,এরপর বুঝি তাঁদের না পালা এলো। তাই তড়িঘড়ি দুই ছেলে টুবান আর তুতু কে নিয়ে বাপের বাড়ী উঠেছিল অনামিকা। শ্বশুর বিয়ের আগেই গত হয়েছিলেন। শাশুড়ি মারা গিয়েছেন, ছোট ছেলে তুতুর জন্মের পরে পরেই। এই বাড়ীতে সংসার বলতে, দুই ছেলে, সে আর স্বামী সুবিমল। সুবিমলের একটি ঝাড়াইমশলার দোকান রয়েছে, চাইপাট বাজারে। ভালোই চলে। সে এখন দোকানেই রয়েছে। ফিরতে ফিরতে তার রাত এগারোটা। তার আগেই, ছেলেরা খেয়ে,ঘুমিয়ে পড়ে। অনামিকা আর সুবিমলের একটু রাতই হয় সবকিছু গোছাতে।

এই মুহূর্তে, বাড়িতে রয়েছে,অনামিকা আর তুতু। বড়ছেলে টুবান, সপ্তাহখানেক হল,পাতিরামপুরে গিয়েছে পিসিরবাড়ি। আগামী পরশু নাগাদ ফিরে আসার কথা। অনামিকা তুতুকে বসে বসে, পড়াচ্ছিল এতক্ষণ। ইলেকট্রিকের কাজের জন্য সারাদিনই তেমন একটা কারেন্ট ছিল না, তাই এমারজেন্সি চার্জেও বসানো হয়নি। তাই সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই দেহ রেখেছে সে। তাই বাধ্য হয়ে হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়েছে। তুতুকে পড়াতে পড়াতেই আচমকা অনামিকার খেয়াল হল,পাতা পড়ে ছাদে জল জমছিল। বিকেলে তাই এক প্রকার বৃষ্টি ভিজে ভিজেই,ছাদ পরিষ্কার করেছিল সে। তখন আর ছাদের দরজায় তালা লাগাতে মনে নেই। দেরী না করে,তুতুকে ঘরে পড়তে বসিয়ে, ছাদের দরজায় তালা দিতে

এসেছে সে। তালাটা লাগিয়ে,তালায় একটা টান মেরে মাত্র একধাপ পা, নীচে নেমেছে ঠিক এমন সময়ই, একটা বিসদৃশ শব্দে অনামিকার পা জোড়া যেন আটকে গেলো সিঁড়ির ধাপেই। শব্দটা আসছে ছাদ থেকে। ঠিক কেউ যেন,ছাদের জমা জলে ছাপক ছপাক শব্দ তুলে একমাথা থেকে আরেকমাথা,দ্রুত পায়ে ছুটে চলেছে। একপাশে থেকে আরেকপাশ। আরেকপাশ থেকে আরেকপাশ।

কে ছাদে?

অনামিকা,খানিকটা ভয় পেল। এই অন্ধকার রাতে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে,কেই বা এমন করে ছাদের মধ্যে ছুটে বেড়াবে? আচ্ছা?মন্ত্রমা নয় তো? ভাবতে ভাবতেই,অনামিকা সারা শরীরে যেন লোম খাঁড়া হয়ে গেলো। আর ঠিক তারপরেই মনে পড়ল, মিলির মেয়ে জন্মানোর সাথে সাথেই,চাইপাটের মাটি থেকে মন্ত্রমার প্রকোপ চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে?ছাদে কে? চোর নয় তো?

অনামিকা কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবল। দেখবে একবার দরজা খুলে? দেখাটা কী বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কিন্তু না দেখলেও,একটা প্রচণ্ড আগ্রহ কাজ করছে তার মধ্যে। অনামিকা প্রায় শব্দ না করে, ছাদের দরজার তালাটা খুলে ছাদে দাঁড়াতেই টের পেল, বৃষ্টিটা থেমেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া কই? আচমকাই যেন, জায়গাটার বাতাস,ভারী হয়ে উঠেছে। সে টর্চের উজ্জ্বল আলো, ছাদের একমাথা থেকে আরেকমাথায় ফেলল। উঁহু! কোথায় কে?কেউ তো নেই। কিন্তু সে যে স্পষ্ট শুনল, জলের অপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার শব্দ। কয়েকমুহূর্ত ছাদে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল অনামিকা। অন্ধকার রাত্রি, সেই সঙ্গে বৃষ্টির আবহ, আর তার মধ্যেই এই ধরনের শব্দ যার কোন উৎস নেই। অনামিকা আর দেরী করল না। কেন কে জানে? ছাদে নেমে দাঁড়ানোর পর থেকেই,সে টের পাচ্ছে, বুকের ওপর ভারী কিছু যেন চেপে বসেছে। সে তাড়াতাড়ি,সিঁড়িঘরে, উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতহাতে,ছাদের দরজাটা টেনে দিলো, তারপর তালাটা লাগিয়ে,যেই কয়েকটা ধাপ সিঁড়ি

দিয়ে নেমে এলো,ওমনি টর্চলাইটের সাদা আলোটা সিঁড়ির ওপর পড়ল। আর সিঁড়ির উপর পড়তেই,অনামিকা যা দেখল, তাতে সে টের পেল,তার ঘাড়ের লোমগুলো একটা একটা করে খাঁড়া হচ্ছে শীতল আতঙ্কে। সিঁড়ির ধাপে দুটো বড় বড় হাতের জলছাপ। সেই ছাপ ক্রমশ ছাদ থেকে দোতলার দিকে নেমে গিয়েছে। যেন কেউ,দুহাতে জিমনাস্টিক এর মত ভর দিয়ে ছাদ থেকে নেমেছে। কে নেমেছে ছাদ থেকে?কে?

"কোন কী উপায় নেই বাবা?"

সামনে জ্বলে ওঠা, ধুনির লালচে হলুদাভ আলোয়, সিঁদুর আর ছাইমাখা মুখটা কেমন যেন ভয়ানক হয়ে উঠেছে মাকড়িবাবার।

কথাটা শোনার সাথে সাথেই বক্তার মুখের দিকে তাকাল মাকড়িবাবা। চাইপাটের গ্রামের মাথা হিসেবে যে কজনকে ধরা হয় তারা আজ সকলেই উপস্থিত হয়েছে মাকড়িবাবার আস্তানায়। তাঁদের মধ্যেই বিসম্ভর প্রামাণিক বলে একজন করজোড়ে হাঁটুমুড়ে বসে রয়েছে বাবার আসনের কিছুটা তফাতে। বেশ কিছুদিন আগেই নোনাকুরির জঙ্গল থেকে গ্রামেরই মুখ্য শ্মশানের একপাশে আস্তানা গেড়েছে মাকড়িবাবা।

উলি গত হয়েছে অনেকদিন হল। উলির জায়গায় দাইয়ের কাজটা এখন তার মেয়ে ফুলি সামলাচ্ছে। সেদিনের সেই ঘটনার পর উলি আর দেরী করেনি। দুদিনের মাথায় লোকনাথ কবিরাজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সে। ওদিকে মাথার আঘাতে সপ্তাহখানেক কাবু ছিল মাকড়িবাবা। তার বিশেষ কিছু করে ওঠার আগেই, মেয়েকে সংসারী করে দেয় উলি। আর সেই থেকেই উলি আর ফুলির ওপর প্রবল রাগে ফুঁসছিল মাকড়িবাবা। তার বানী মিথ্যে করে দেওয়ার অপরাধে সে উলির চরমক্ষতি করতে চাইছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে সেই চরমক্ষতি করবার আগেই উলি একরাতে আচমকা ছিল থেকে নেই হয়ে গেল। আর উলির যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এসে পড়ল ফুলির ওপর। এদিকে সদ্য গৃহিণী হওয়া ফুলি নিজে গর্ভবতী

হয়ে পড়ায় কাজ আর সংসার একসঙ্গে সামলাতে পারছিল না। ফলত যা হওয়ার তাই হল, প্রচণ্ড শারীরিক শ্রম আর মানসিক চাপে পাড়ারই এক মহিলার প্রসবচলা কালীন, ফুলির নিজেরই গর্ভপাত হয়ে সন্তান মারা গেলো। প্রথম সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুতে ফুলির স্বামীর স্বামীর সমস্ত আক্রোশ ফুলির কাজের ওপর গিয়ে পড়ে। নিষিদ্ধ হয় ফুলির দাই এর কাজ।এদিকে উলির অনুপস্থিতি আর ফুলির নিজেকে সরিয়ে নেওয়াতে চারিদিকে যেন মৃতের রোল ওঠে। মড়কের এই পরিস্থিতি দেখে বিহ্বল ফুলি কোনোরকমে নিজের অসন্তুষ্ট স্বামীকে রাজী করায় শুধু একটিই শর্তে, যে সে মা হওয়ার সাথে সাথেই এই কাজ একেবারে ছেড়ে দেবে। ফুলির স্বামী এই শর্তে রাজী হয়। ফুলি এখন আবার গর্ভবতী। নিজেকে ধীরে ধীরে কাজ থেকে দূরে সরাচ্ছে সে। আর এখানেই হয়েছে বিপত্তি। চাঁইপাটের লোকজন বেশ বুঝতে পারছে, ফুলির এসব আগাম অবসর নেওয়ার প্রস্তুতি। আর তাঁরা এটাও জানে, এই আগাম অবসরের পরিণতি কী হতে চলেছে। ফুলি এই কাজ থেকে একবার সরে এলে চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়বে। ওরা বিশ্বাস করে এদের মা মেয়ের হাতেই ছিল আর রয়েছে পোয়াতি আর তার সন্তান বাঁচানোর অদ্‌ভুত ক্ষমতা। কিন্তু এবার? এবার কী হবে? বুঝতে না পেরে তাঁরা হাজির হয়েছে মাকড়িবাবার ডেরায়। দলে বিসম্ভর প্রামাণিক ছাড়াও রয়েছে আরো বেশ কিছুজন। সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

"উপায়?" কথাটা বলেই কয়েকমুহূর্ত নীরব রইলেন মাকড়িবাবা। "উপায় একটাই। আগেরদিন যা তোদের বলেছিলাম, সেটাই একমাত্র উপায়। ফুলির গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে হবে। যে কারণের জন্য সে কাজ বন্ধ করতে চাইছে, সেই কারণই যদি না থাকে..."

"গর্ভের সন্তান নষ্ট মানে তো, প্রাণের হত্যা বাবা!" কথাটা বলেই কেঁপে উঠলেন, বয়োঃজ্যেষ্ঠ জয়দেব সামন্ত। নিজেদের স্বার্থের জন্য জেনেবুঝে মানুষ খুন করবো আমরা..? পাপ হবে না এতে?"

কথাটা শুনেই আচমকা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন মাকড়িবাবা। “পাপপুণ্য আমায় শেখাচ্ছিস? আমায়? ফুলি যে কাজ বন্ধ করে এতগুলো মা আর তার সন্তানের জীবন বিপন্ন করছে তার বেলা? সেটা জেনেবুঝে মানুষ খুন করা নয়?”

মাকড়িবাবার কথা শুনে উপস্থিত সকলে চুপ করে রইল। ধুনির আলোয় দেখা গেলো, মাকড়িবাবা নিজের কোঁচড়ের আড়াল থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে বিসম্ভর প্রামাণিকের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিলেন।

“এতে একজন কবিরাজের ঠিকানা আছে। তার কাছে এমন কিছু ওষুধের সন্ধান আছে, যাতে ফুলির সন্তান গর্ভেই শেষ হয়ে যাবে। তার কাছে গিয়ে আমার নাম করে পুরো ব্যাপারটা বলবি। সেই ওষুধ এনে ফুলির খাওয়ার জলে মিশিয়ে দিস একটু একটু করে। তিনদিন। তিনদিনের পর ভালো খবর শুনতে পাবি। তখন এসে এখানে সিদে দিয়ে যাস। “

“বাবা? এতে ফুলির কিছু হবে না তো?” বিসম্ভর প্রামাণিক আমতা আমতা করে কথাটা বলে উঠতেই মাকড়িবাবা, একটা চোরা হাসি হাসলেন সকলের চোখ এড়িয়ে, তারপর মনে মনেই বলে উঠলেন। ফুলির এতো সহজে তো কিছু হতে দেওয়া চলবে না। তাহলে তো এতদিন ধরে করে আসা এই পরিকল্পনা পুরোটাই বৃথা। ফুলিকে তার চাই। শুধু ফুলিকে নয়। ফুলির তৃতীয় সন্তানকেও।

তার জন্মের জন্যই তো এতো আয়োজন...

****

অনামিকা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামছে। ধীর পায়ে, সে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তার গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকেই। বারান্দার দুদিকে দুটো দুটো মোট চারটে মুখোমুখি ঘর। অনামিকা দেখল, সেই জল ছাপ,ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দোতলারই একটি ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। যেই ঘরের দরজাটা আলতো করে ভেজানো।

সে টের পাচ্ছে, একটা নিদারুণ ভয়ে তার বুকের ভেতরটা খালি হয়ে এসেছে যেন। তবুও এক অদম্য কৌতূহলে সে সেই ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলতেই,টর্চলাইটের উজ্জ্বল আলো অন্ধকার ঘরের বুক চিরে ফালা ফালা করে দিলো। এই ঘরটি মূলত আত্মীয় সজন আসলে, অতিরিক্ত ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই এই ঘরে,মোটামুটি আসবাব পত্র রয়েছে। অনামিকা দেখল, জল ছাপটি সারা ঘর জুড়ে ঘুরে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই, টর্চের আলো ঘরের প্রত্যেকটা অন্ধকার কোন ফালা ফালা করে দিচ্ছে, কিন্তু কোথায় কী?কেউ নেই... ঠিক এমন সময় কী মনে হতেই, অনামিকা যেই আলোটা আলমারির মাথার অপর তাক করলও। ওমনি একটা হিমশীতল অনুভূতি, একটু একটু তার পেটের ভেতরটা খালি করে দিলো যেন।

আলমারির মাথায় একটা কালো শরীর। কঙ্কালসার চেহারার উপর, কালো কুচকুচে চামড়ার আবরণ, সারা শরীরে,সাদা সাদা পোকায় কিলবিল করছে। কোমরের নীচ থেকে অনুপস্থিত সেই দেহ দুটো হাতের ওপর ভর করে দাঁড়িয়েছে। ধড়ের ওপর একটা লম্বা মাথা, যার থুতনি এতোটা সুঁচালো যে সেটা প্রায় ছাতিতে এসে ঠেকেছে। বিস্ফারিত বড় চোখ, আর তীক্ষ্নদাঁতের সারি ও কুঁচকুঁচে কালো জিভ বের করা একটা চওড়া, হাসি। টর্চের উজ্জ্বল সাদা আলো সরাসরি ওই ভয়ঙ্কর জিনিসটার ওপরে গিয়ে পড়ছে।

অনামিকা আঁতকে উঠে দুপা পিছিয়ে আসতেই, জিনিসটার গলার ভেতর থেকে একটা খিক খিক করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। আর তারপরেই জিনিসটা দুহাতে ভর দিয়ে অতিদ্রুত নেমে এলো আলমারি বেয়ে। সেই গতি এতোই ক্ষিপ্র যে, অনামিকা কিছু করবার আগেই,সেটা অনামিকার মুখোমুখি মেঝের ওপর নেমে দাঁড়ালো। অনামিকা আর একমুহূর্ত দেরী না করে, প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আর বেরোনোর সাথে সাথেই, দরজাটা একহাতে টেনে বাইরে থেকে লক করে দিলো।

ওদিকে,ঘরের ভেতর থেকে কাঠের দরজার ওপর দড়াম দড়াম শব্দ হচ্ছে। অনামিকার বুকটা হাপরের মত ওঠা নামা করছে। সে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বরাবর নামছে। এ কী ভয়ঙ্কর জিনিস! এখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না অনামিকা। সে ঠিক দেখছে তো? ঠিক শুনতে তো, নাকি সবটাই তার ভ্রম। এই ভয়ঙ্কর জিনিসটার সাথে একমুহূর্ত আর এই বাড়ীতে নয়। তুটুকে নিয়ে এক্ষুনি সে বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে... আর কথাটা ভাবতে ভাবতেই, একতলা আর দুইতলার মাঝের ল্যান্ডিংএ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

নীচতলাটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। একটু আগেও ঘরের ভেতরের হ্যারিকেনের আলো একতলার ড্রইংরুমে এসে পড়ছিল। কিন্তু এখন সেটুকুও অনুপস্থিত। তুতুর পড়ার আওয়াজও তো পাওয়া যাচ্ছে না। তুতু কই?তুতু ঠিক আছে তো? অনামিকার মনে হল, কেউ যেন শক্ত কিছু বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর সে দম নিতে পারছে না।

"তুতু...?তুতু···? ক কই তুই?"

নাহ,কোন সাড়া নেই। অনামিকা টের পাচ্ছে,আতঙ্কে, তার গলা থেকে ডাকটাও ঠিকঠাক বেরোচ্ছে না। সে ধীরে ধীরে একতলায় নেমে এলো। আর নেমে আসতেই টের পেল, নীচতলাটা অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। যেন কেউ এসি চালিয়ে রেখেছে। অনামিকা পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই ঘরের দিকে,যেখানে তুতু বসে পড়ছিল। দরজার কাছাকাছি পৌঁছাতেই, একটা ক্ষীণ গোঙানির আওয়াজ অনামিকার কানে এসে পৌঁছাতেই, শিউরে উঠল সে,মুহূর্তকাল দেরী না করে, টর্চের আলোটা সরাসরি সে ফেলল,ঘরের ভেতরে।

আর তারপর অনামিকা যা দেখল, তাতে পলকের জন্য,অনামিকার মনে হল, সে বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছে।

ঘরের ভেতরে, তুতুকে কোলে বসিয়ে একজন তার গায়ে,মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর তুতু অন্ধকার ঘরে বসে, প্রবল আতঙ্কে কাঠ হয়ে রয়েছে। চাপা

গোঙানির আওয়াজ সেই ভয় পাওয়া গলার ভেতর থেকেই আসছে। কিন্তু অনামিকা তুতুকে দেখছে না। সে দেখছে, সেই মানুষটিকে,যার কোলে তুতু বসে আছে। একজন মহিলা। যাকে দেখতে হুবহু অনামিকার মতই। শুধু শরীরটা অনেকটা লম্বা। হাতগুলোও। থুতনি টা ছুঁচালো। দুটো ভয়পাওয়া বিস্ফারিত চোখ, অথচ একটা শব্দহীন চওড়া হাসি,যেই মুখের দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা আপনা থেকেই হিম হয়ে আসে। অনামিকা দেখল,মানুষটা(?) তুতুকে কোল থেকে নামিয়ে ধীরে ধীরে,উঠে দাঁড়ালো। আর ঠিক তখনই, অনামিকা দেখল,জিনিসটার মুখের ভেতরটা পুরো কুচকুচে কালো। মাড়ি,জিভ, চোয়াল,টাকরা,আলজিভ, সব। সব কালো। সেই কালো মুখ নিয়েই সে একপা একপা করে এগিয়ে আসছে অনামিকার দিকে। এক বিভীষিকার মত। মৃত্যুর মত।

******

পাশের বাড়ির গাড়ি রাখার গ্যারেজ টিনের তৈরী। তার ওপর মুষলধারে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ,একটা অদ্ভুত সিম্ফনি তৈরী করছে। অনেকক্ষণ ধরেই বিদ্যুতের রুপোলী আলোর ঝিলিক,জানালার গলে, ঘরের ভেতরে এসে উঁকি মারছে নানান ভাবে। ঠিক এমন সময় সজোরে একটা বাজ পড়ার শব্দ, আর ঠিক তখনই আবার সেই বিচ্ছিরি স্বপ্নটা দেখে, নিজের বিছানায় উঠে বসলো মিলি। প্রত্যেকদিনের মত,আজকেও তার অনেকটা সময় লাগলো, স্বপ্নের ঘর থেকে বেরোতে।

অন্ধকার ঘরে বিছানার ওপরে বসেই দুহাতে মাথাটা চেপে ধরল সে। আজকাল রাতে ভালো ঘুম হয়না না তার। এই এক স্বপ্ন বারবার দেখে সে। আজ বিকেলে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে নিজের আগের জীবনের স্মৃতিচারণা করছিল সে। কী ছিল? আর কী হয়ে গেলো এখানে,এই চাইপাটে এসে? যেদিন থেকে এখানে এসেছে,সেদিন থেকেই এই পিশাচ তার পিছু নিয়েছে। সেদিন থেকে শুরু করে, আজ পর্যন্ত,যার জীবনে যা যা কিছু খারাপ ঘটেছে, তারজন্য এই পিশাচটি দায়ী। অথচ সে... সে এখন এই ঘরেই রয়েছে। পরম যত্নে।

সেদিনের ঘটনা, ঘটেছে প্রায়,মাস খানেক হয়ে গেলো। এই একমাসে অনলের সঙ্গে মিলির একপাহাড় দূরত্ব তৈরী হয়েছে। মিলির মনে হয় যে দূরত্ব কোনোদিনই মিটবে না। অনলের ব্যবহারও দিনদিন কেমন একটা হয়ে গিয়েছে। আগে যদিও প্রয়োজনে টুকটাক কথা হত,আজকাল সেটুকুও নেই। অনল সবসময় মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এমনকি বাচ্চা দুধ খাওয়ানোর সময়ও। একটা অদ্ভুত সন্দেহভরা দৃষ্টিতে সে সবসময় নিরীক্ষণ করতে থাকে, মিলিকে। সেই দৃষ্টির অর্থ মিলি বোঝে। অনল মনে করে, মিলি হতো তার সন্তানের ক্ষতি করতে পারে। তাই মিলি,তার মেয়ের কাছাকাছি গেলেই অনল সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারায় থাকে। মিলি প্রথম প্রথম অনলকে তাঁদের সন্তান সম্পর্কে অনেককিছুই বোঝানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু মেয়ের ক্ষতি করতে পারে, এমন কোন আচরণ,সে করেনি কখনই। তারপরেও অনলের এ ধরনের ব্যবহারের অর্থ বোঝেনি সে। একদিন ঘোষাল জেঠিমাই বলেছিলেন, “হ্যাঁ,রে। এসবের পেছনে ওই পিশাচের হাত নেই তো?”

মিলি অবাক, “ওই পিশাচের?ওই টুকু একটা শিশু?”

বোকার মত কথা বলিস না বউ, মনে রাখিস,এ কিন্তু সেই পিশাচ, যাকে মাদুবাবাও শেষ করতে পারেননি। বদলে তিনি নিজেই শেষ হয়ে গিয়েছেন। নিজের স্বামীর অবস্থা দেখিস, মনে হবে, সব সময় কেমন একটা ঘোরে থাকে যেন? আর তুই না বলেছিলি,অনল ফিসফিস করে মেয়ের সাথে সব সময় যেন কথা বলে? এদের অনেক ক্ষমতা রে,অনেক ক্ষমতা।”

মিলির মনে আগে এগুলো নিয়ে দ্বিধা ছিল। কিন্তু আজ আর কোন দ্বিধা নেই।

চাইপাটের অবস্থা আরো করুন হয়েছে। এখানে, ঘরে ঘরে মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকেই হারিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন নাকানি চোবানি খাচ্ছে ঠিক গতবারের মতোই। কিন্তু কোথাও কোন সূত্র পাচ্ছে না। মিডিয়াতেও এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে প্রায়। মন্ত্রমা বিনষ্ট হয়েছে,

এই খবর পেয়ে যারা এখানে বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাঁরা এক এক করে ফেরত এসেছিল। মাসখানেক আগে মিত্রদের বৌদি আর তার ছোটছেলের নিরুদ্দেশের ঘটনায় যে ঘটনার সূত্রপাৎ ঘটেছিল,তার রেশ এখনো চলছে। একটা প্রচণ্ড অশুভ কালো ছায়া, চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে চাইপাটের লোকজনকে। পুলিশ কাউকে এলাকা ছাড়তে বারণ করছে। " "সর্বক্ষণ প্রশাসন পাশে রয়েছে সহায়তায়," এই স্লোগানের মাইকিং চলছে থেকে থেকেই। কিন্তু কোথায় কী?লোকজন যে যার মত, পালাচ্ছে। হয় দেখিয়ে নয় লুকিয়ে। আগেই চাইপাটের লোকজনের পরিমাণ কম ছিল। এখন এই ঘটনায় আরো কমেছে।

মিলির বারবার মনে হয়, চাইপাট ছেড়ে চলে গেলে সব কিছু হয়তো ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু অনল এই মেয়েকে ছাড়া কোথাও যাবে না। আর এই মেয়ে যেখানে যাবে, সেটাই তো নরককুণ্ড। সেদিনের এই মেয়ের ফিরে আসা দেখেই সে বুঝেছিল। এতো সহজে এই পিশাচ তো তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। সব কিছুই তার সাথে এখন খারাপ হচ্ছে, ভালো বলতে কিছুদিন এ আগে পাড়ার ই এক প্রসূতিতে ডেলিভারিতে সাহায্য করা ছাড়া। মিলির মনে হয়,সে দিনদিন একটা ভয়ঙ্কর পানাপুকুরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, যার থেকে বেরোনোর উপায় তার জানা নেই। আশেপাশের লতাপাতা যাদের আঁকড়ে ধরে,সে উঠবে বলে ভেবেছিল, তাঁরাও কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছে। এই অনলকেই তো দেখছে সে। দুজনে এখন তাঁরা আলাদা ঘরে ঘুমায়। ওদিকে ঘোষাল জেঠিমা, যে কিনা এতো অন্ধকারেও তার কাছে একটুকরো আশার আলো মত ছিলেন, তিনিও একদিন সন্ধ্যায়, হঠাৎ হাজির হলেন,তার বাড়ি। বললেন,

"বউ,সাবধান থাকিস। সময় ভালো নয়। আমি কদিন একটু আমার বাপের বাড়ি যাচ্ছি। কাল ভোরেই রওনা দেব। ফিরবো তাড়াতাড়ি। নিজের আর নিজের স্বামীর খেয়াল রাখিস। "

সেই যে গেলো জেঠিমা, তারপর তিনদিন হয়ে গেল,তার কোনো পাত্তা নেই। কবে আসবে সেটুকুও জানে না। মিলির বুকের ভেতর থেকে একটা

চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তার সাথে সব কিছু খারাপ হচ্ছে। সব। এমন সময় বহুদূরে কোন বাড়ি থেকে, ঝমঝমে বৃষ্টিধ্বনি ছাপিয়ে শঙ্খধ্বনির আওয়াজ মিলির কানে এসে লাগলো। জানালার বাইরে তাকিয়ে মিলি দেখল, সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে ঝুলে এসেছে চারিদিকে। ইশ! দেরী হয়ে গেলো এতো? অন্যদিন অনলের টুকটাক কাজকর্মের আওয়াজ পাওয়া যায়। কিন্তু আজ এতো চারিদিক চুপচাপ কেন?ঠিক তখনই তার মনে পড়ল, অনল আজ অফিসের কাজে বালুরঘাট গিয়েছে। না সে তাকে বলে যায়নি। পাশের পাড়ারই একজনকে সে ঠিক করেছে, মেয়ের দেখা শোনার জন্য। বলা ভালো, পাহারার জন্য। মেয়েটি ঠিক রেশমিরই বয়সী। নাম কমলা। আজ সকালেই এসেছে। খানিকটা,মিলিকে শোনানোর মতন করেই নিজের আজকের প্ল্যান সে বলে গিয়েছে কমলাকে। তখনই মিলি জানতে পেরেছে, অনলের ফিরতে আজ বেশ রাত হবে।

মিলি অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়েই ড্রইংরুমে বেরিয়ে এলো। এখন তার এই ঘরের মানচিত্র মুখস্থ। সারা ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তা নেহাতই কম। মিলি নির্দিষ্ট জায়গায় হাত দিয়ে সুইচটা অন করতেই খুঁট করে একটা শব্দ হল। কিন্তু কোন আলো জ্বললো না। মিলি বুঝল,রোজকার মত আজও লোডশেডিং। দুপুরে ঘুমনোর আগে সে এমারজেন্সিটা চার্জে বসিয়েছিল। হাত বাড়িয়ে এমারজেন্সিটা নামিয়ে এনে, সুইচটা কোন করতেই,ড্রইং রুমে, একটা অনুজ্জ্বল সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল অচিরেই।

মিলির মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটা বিরক্তির শব্দ।এমারজেন্সিটা একদমই চার্জ হয়নি। যে কোনো মুহূর্তে আলো টা নিভে যেতে পারে। সে দেরী না করে, হাত পা ধুয়ে,ঠাকুরের কাছে ধুপ প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করতে করতেই আচমকা,কমলার কথা মনে পড়ল। এই রে, মেয়েটা কোথায়?অনলের ঘরে নাকি...? মিলি অনলের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। দরজাটা ভেজানো। মিলি চৌকাঠের ফাঁকে মুখ লাগিয়ে ডেকে উঠল

"কমলা?"

নাহ,কোন সাড়া নেই। মিলি আরেকবার ডাকতে যাবে, ঠিক এমন সময় বাইরের দিক থেকে একটা খিলখিলে হাসির শব্দ। মিলি খানিকটা ভ্রু কুঁচকে, একতলায় ঢোকার মেইন দরজাটা খুলতেই, ওপরের দিক থেকে,একটা খিলখিলে হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। দোতলার ল্যান্ডিঙের অন্ধকারে বসে বসে কমলা কার সাথে যেন কথা বলছে ফোনে। ঠিক রেশমির মত।

মিলি মনে মনে হাসল, নিশ্চয়ই কারো সঙ্গে প্রেম করছে। কথাটা ভাবতে ভাবতেই মিলি যেই একহাতে দরজাটা বন্ধ করল ঠিক তখনই একটা ভাবনা তার মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিকের মত ধাক্কা মারল।

"মেয়েটা কী তাহলে রুমে একলা আছে?" কথাটা ভাবা মাত্রই মিলির চোয়াল যেন আপনা থেকেই শক্ত হয়ে উঠল। সে ধীর পায়ে অনলের সামনে গিয়ে দরজাটা আলতো হাতে ঠেলতেই,একটা মৃদু ক্যাঁচ করে শব্দ। আর সাথে সাথে, এমারজেন্সির অনুজ্জ্বল সাদা আলোটা ঘরের ভেতরে এসে পড়ল।

মিলি সেই আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল বিছানার ওপর শুয়ে সেই বাচ্চাটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণ সে চুপ ছিল,কিন্তু আচমকা দরজার মিলির ছায়াকে দেখতে পেয়েই, সেই নিঃশব্দ ফোকলা হাসি হাসতে লাগলো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। এইটুকু একটা শিশুর এই হাসি, অন্যের কাছে ভীষণ স্নিগ্ধ হতে পারে, কিন্তু মিলির সেই হাসি দেখেই আপাদমস্তক জ্বলে উঠল।

তার জীবনে, যা যা দুর্ভোগ ঘিনিয়ে এসেছে। তার জন্য এই মেয়ে দায়ী। শুধু তার জন্য না। আজ পর্যন্ত, যারা যারা হারিয়ে গিয়েছে,বা মারা গিয়েছে, এই চাইপাটে তার জন্যও দায়ী এই মেয়ে। অনলকেও বশ করেছে এই মেয়ে। এই মেয়ে জন্মানোর আগেই অনলের প্রাণ নিতে চেয়েছিল। এই মেয়ে যেই জায়গায় থাকবে, সেই জায়গার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই মানুষরুপী ভয়ঙ্কর পিশাচের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

মিলি দেখল, কথা গুলো ভাবার সাথে সাথেই,বাচ্চাটির মুখের হাসি কেমন যেন মিলিয়ে গেল। সে শুধু,চুপটি করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মিলির দিকে। মিলি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো বাচ্চাটির দিকে। বাচ্চাটি সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। মিলিকে যেন কোন এক আসুরিক কিছু ভর করেছে। মাদুবাবা এই পিশাচকে মারতে চেয়েছিলেন,কিন্তু পারেনি।সে সন্তান হারানোর কষ্টে মুষড়ে পড়েছিল সেদিন। কিন্তু মাদুবাবা,বলেছিলেন, যা কিছু খারাপ,তাকে গোঁড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হয়। তাই আজ সে নিজের হাতে নিজের সন্তান কে শেষ করবে। আর আর কোনো টান নেই। আজ আর কোনো ভেঙে পড়া নয়...

সে একপাশ থেকে একটা বালিশ তুলে নিলো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে ধীরে সেই বাচ্চাটির,মুখ লক্ষ্য বালিশটা রেখে সজোরে চেপে ধরল বালিশটা। কিন্তু এ কী?কোনো অনুভূতি নেই তো বালিশের নীচে? যেন নীচে কেউ নাই...

মিলি বালিশটা বিছানা থেকে তুলে বাচ্চাটিকে, চেক করতে গিয়েই আরেকপ্রস্থ অবাক হওয়ার পালা। নাহ, মেয়েটি নেই তো বিছানায়। এক্ষুনি তো এখানে... ছিল কই গেলো?

কথাটা ভাবতে যতক্ষণ, আছমকা মিলির মনে হল,জায়গাটার তাপমাত্রা হু হু করে কমে আসছে যেন। আর ঠিক তখনই,ঘাড়ে একটা শীতল স্পর্শ। আর সাথে সাথে একটা হ্যাঁচকা টান। মিলির মনে হল,কেউ যেন ওর শরীরটা অনলের ঘর থেকে টেনে বের করে শূন্যে তুলে আছাড় মেরেছে ড্রইংরুমের মেঝেতে।

সাথে সাথে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল মিলি। কোমরে আর ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যাথা পেয়েছে। কিন্তু এসব দেখার সময় নেই। একপাশে গড়াগড়ি খাওয়া এমারজেন্সির আলো তে সে দেখতে পেয়েছে সামনের মানুষকে। কমলা। কিন্তু এ কী অবস্থা হয়েছে তার...

ফুলছাপের হলুদ নাইটি পরা দেহটা অনেকটা লম্বা হয়ে গিয়েছে। এতটা লম্বা যেন ছাদ,মাথায় ঠেকে যাবে। কাঁধের দুইপাশ থেকে হাৎ গুলো এত লম্বা যে সেগুলো মাটিতে লোটাচ্ছে। শরীরটা কেমন সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, আর তাতেই মনে হচ্ছ ,সরু থুতনিটা বুঝি বুক ছুঁয়ে ফেলবে। মাথার চুল অর্ধেক ঝরে, টাক দেখা যাচ্ছে। মুখের অবস্থা আরোও বীভৎস। ভয় পাওয়া দুটো চোখ বিস্ফারিত। অথচ মুখে রয়েছে চওড়া হাসি। মিলি এমারজেন্সির আলোয় এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কমলার মুখের ভেতরটা কুচকুচে কালো।

নাহ,এ কমলা নয়, কমলার রূপে,এ হল সেই ভয়ঙ্কর পিশাচ।যে এসেছে মিলিকে শেষ করতে। আচমকা এমারজেন্সীর আলোটা দপদপ করে উঠল, আর সেই আলোয় দেখা গেলো,কমলারূপী সেই পিশাচ নিজের দুটো হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।আর সাথে সাথে মিলির দেহটা ঘরের ঠিক মধ্যিখানে শূন্যে ভেসে উঠল।

মিলির মনে হল, অদৃশ্য চারটে দড়ি চারদিক থেকে টানটান করে তার হাত পা বেঁধে রেখেছে। তার নড়াচড়ার ক্ষমতা সেই বাঁধনে লোপ পেয়েছে। ঠিক এমন সময় একটা প্রচণ্ড গর্জনের শব্দ বেরিয়ে এলো সেই পিশাচ গলার ভেতর থেকে। মিলি চমকে দেখল কমলা সামনে প্রসারিত, নিজের দুটো হাতকে ধীরে ধীরে পাকাতে শুরু করেছে।

আর ঠিক তারপরেই মিলি প্রচণ্ড আর্তনাদে চিৎকার করে উঠল। সারা শরীর জুড়ে,প্রচণ্ড জ্বালা। এত জ্বালা, যেন মনে হচ্ছে কেউ তার সারা শরীর অজস্র ধারালো কিছু দিয়ে ক্রমাগত, চিরে ফেলছে চামড়ার ভেতরে। ওদিকে কমলা হাসছে খিকখিক করে, কী ভয়ঙ্কর লাগছে,ওকে হাসতে দেখে, কিন্তু মিলির সেদিকে নজর নেই। মিলির কোন দিকে নজর নেই। এই যন্ত্রণার চোটে তার নিজের জাগতিক সমস্ত অনুভূতি যেন লোপ পেয়েছে। তার মনে হচ্ছে,সে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সত্যি সত্যি এবার মারা যাবে।

আর ঠিক তখনই, দড়াম করে প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ। যেন কেউ বাড়ির সদরের দরজাটা ভেঙ্গে ফেলেছে। কমলা অবাক হয়ে একতলার দরজার দিকে তাকালো,কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় সেটাও একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় বিকট শব্দ করে খুলে গেলো,আর সেই দরজা দিয়ে ঢুকল তিনটে শরীর। দুজন মহিলা, একজন পুরুষ। মহিলার মধ্যে দুজনেই বয়স্ক, তবে দুজনের মধ্যে যার কম বয়স,তার পাকা চুলের সিঁথির মাঝে জ্বলজ্বল করছে লাল সিঁদুরখানা। ঘোষাল জেঠিমা! চোখে মুখে অবর্ণনীয় কাঠিন্য। অপরজনের বয়স আন্দাজ করা চলে না, জটাজুটওলা মহিলার শরীর ভর্তি নানান আকৃতির আব। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে রয়েছেন। সম্ভবত বার্ধক্য জনিত কারণ । বয়স একশো ও হতে পারে, অথবা তার ও বেশি।

ওদের দেখে আচমকাই কমলারূপী সেই পিশাচ সোজা টানটান হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। কমলার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, চাপা গর্জন। এমারজেন্সির আলোটা ভয়ঙ্কর ভাবে দপদপ করছে। কমলা আচমকা তার লম্বা শরীরটাকে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে দিলো। ঠিক ওই আবওয়ালা বুড়ির অনুকরণে। তারপর দুলুনির আকারে, সামনে পেছনে দুলে উঠতেই আচমকা ন্যাড়া মাথার পুরুষটি, সামনে এগিয়ে এলো। লোকটির ঠোঁটের কোল থেকে বেরিয়ে আসছে, অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ। আচমকা সে বামহাত স্থির রেখে ডানহাত মাথার ওপর তুলে এমন বনবন করে ঘোরাতে লাগলো,দেখে মনে হবে, সে যেন কোন অদৃশ্য দড়ি ঘোরাচ্ছে। আর তারপরেই হাত জোড়ার এমন ভঙ্গী করল সেই লোকটি, যেন সে সেই অদৃশ্য দড়িখান ছুঁড়েছে,সেই পিশাচ এর উদ্দশ্যে। সাথে সাথে কী একটা হল, কমলা রূপী পিশাচের লম্বা দেহটাকে দেখলে মনে হবে, সারা শরীর জুড়ে তাকে কেউ কোন অদৃশ্য দড়ি দিয়ে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছে। তার যেন নড়ার ক্ষমতা নেই। একমুহূর্ত দেরী না করে ন্যাড়া লোকটি সাথে সাথে একটা লাফ দিয়ে জাপটে ধরল পিশাচ এর পা জোড়া,আর সাথে সাথে, ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল,কমলা। আর ঠিক তখনই,সেই আবওয়ালা, অতিবৃদ্ধা,চিৎকার করে উঠলেন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

একটা ছড়া। তখন তার চোখে মুখে,তেজ ঝরে পড়ছিল, কে বলবে, ইনি একজন অশীতিপর বৃদ্ধা।

“অদনবন্ধী বদনবন্ধী

বন্দী হল নাম

বন্ধী আকাশ বন্ধী বাতাস

মন্ত্রবন্দী কাম”

মন্ত্র বিঁধে মন্ত্র মারে

মন্ত্র বাঁধে সদা।

মন্ত্র মন্ত্র মন্ত্র পড়ি

পিশাচ পড়ুক বাঁধা।। “

আর তারপরেই প্রচণ্ড একটা অপার্থিব চিৎকার। সাথে সাথে পুরো ঘর, ভরে উঠল বিকট পোড়াগন্ধে। ওদিকে মিলির চোখের পাতা ধীরে ধীরে ভারী হয়ে আসছে। কিন্তু জ্ঞান হারানোর আগে স্পষ্ট টের পেয়েছে, তার শরীরটা আর শূন্যে ভেসে নেই। সেটা ধীরে ধীরে,নীচে নেমে এসেছে।

*****

মিলি যখন চোখ খুলল, তখন কারেন্ট ফিরে এসেছে। সে দেখতে পেল,তাকে তার বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। আর কতগুলো মুখ, তার মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এদের মধ্যে একটা মুখ দেখেই, তার আবার সেই পুরনো আতঙ্ক ফিরে এলো, মিলি, কমলার দিকে আঙুল তুলে আর্তনাদ করে উঠল, “ও এখানে কেন?ও এখানে কী করছে?”

ঘোষাল জেঠিমা মিলিকে নিরস্ত করলেন। জানাল, কমলা এখন সুস্থ। পিশাচ তার শরীরে আশ্রয় নিয়ে, মিলিকে আক্রমণ করেছিল ঠিকই। কিন্তু খেমি মা,পাগলা সঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছে বলে মিলি, আজ প্রাণে

জীবিত আছে। কথাটা বলেই ঘোষাল জেঠিমা, সেই আবওয়ালা ন্বুজ বৃদ্ধাকে আর তার সঙ্গের টাকওয়ালা পুরুষকে ইঙ্গিত করলেন।

"আমার বাপের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের হেমতপুরে। খেমি মা,আর পাগলাকে আমি ওখান থেকেই এনেছি। তবে এনাদের সন্ধান পাওয়া এত সোজা নয়। আমি কী করে এনাদের পেলাম সেই ইতিহাস এখন না জানলেও হবে। শুধু জেনে রাখিস, তোর অনেক ভাগ্যি ভালো, যে খেমি মা তোর সাহায্যে এতোদূর এসেছেন। নইলে মা নিজের গড় ছেড়ে পা বাড়ান না কোথাও। মাদুবাবা থাকলে মায়ের দরকার পড়তো না। মা কোথাও জান না, কারো ডাকে। কিন্তু আমি যখন তোর পুরো কথাটা মাকে বললাম, মা আমায় বললেন,তিনি আগেই নাকি এসব টের পেয়েছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন সঠিক সময়ের। "

যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থাতেও মিলি খেমি মায়ের সেই তেজ টের পেয়েছে। মিলির চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এলো ঘোষাল জেঠিমার প্রতি কৃতজ্ঞতায়। এই মহিলা তার রক্তের কেউ নন। অথচ কত কী করছেন তার জন্য। বাকিরাও কত কী করেছে, শুধুমাত্র তার জন্য। অথচ তারপরেও সেই পিশাচ বারবার জিতে যাচ্ছে? বারবার?

মিলি দেখল, খেমি মা, তার পাশে এসে বসলেন। বড় বড় নখ, নোংরা পোশাক,মাথায় জটাজুট, সারা শরীরে মুখে আবে ভর্তি এই মহিলা বহিরদৃস্টিতে কুরূপা হলেও,আজ মিলির জন্য ইনিই প্রাণদাত্রী। ইনিই ছিলেন বলেই আজ মিলি জীবিত। কেন কে জানে?মাদুবাবা কে দেখে, যে ভরসা মিলি পায়নি,এনাকে দেখে যেন সেই ভরসা অচিরেই মিলির বুকে ঠাঁই পেল।

"কীরে?শরীর ঠিক আছে? পারবি তো?আসল কাজ কিন্তু তোকেই করতে হবে?"

কি কাজ? কত কঠিন কাজ সেসব প্রশ্ন না করেই মিলি,সম্মতির সুরে মাথা নাড়াতেই, খেমি মা মুচকি হাসলেন।

খেমি মা, এবার গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন,"যে পিশাচ জন্ম নিয়েছে, তাকে আটকানো এত সোজা নয়। তার জন্ম অতীতে। তাই বর্তমানে তার প্রভাব প্রচণ্ড। তাকে যে আটকাতে পারতো, সেই মন্ত্রমা এতদিন ধরে তাকে আটকাচ্ছিল। কিন্তু এই পিশাচের জন্মের সাথে সাথে, তার অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলীন হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে, আমাদের কারোরই ক্ষমতা নেই,তাকে আটকানোর। একমাত্র মন্ত্রমা ছাড়া। "

"কিন্তু আপনি তো বললেন, মন্ত্রমার নাকি অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাহলে?" মিলি অবাক চোখে ঘোষাল জেঠিমার দিকে তাকালো। ঘোষাল জেঠিমা,গভীর চিন্তায়।

"পুরনো,মন্ত্রমার, অস্তিত্ব,বিলীন হয়ে গেলে, নতুন মন্ত্রমা,তৈরী করতে হবে। "

মিলি খেমি মায়ের কথার অর্থ বুঝতে পারলো না।

"নতুন,মন্ত্রমা! সেটা কীভাবে সম্ভব? আর কে হবে নতুন মন্ত্রমা। " মিলির প্রশ্নে খেমি মা, শুধু একটু মুচকি হাসলেন,তারপর তার গালে হাত রেখে বললেন, "গতবারে যে হয়েছিল। এবারেও সেই হবে?"

এইসব হেঁয়ালির অর্থ মিলির একদম বোধগম্য হচ্ছে না। "গতবারে কে হয়েছিল?সে তো উলির মেয়ে ফুলি ছিল..."

"কেন?পিশাচ তোর গর্ভে জন্ম নেওয়ার জন্য, ফুলির জীবনের প্রত্যেকটা অঙ্কের সাথে তোর জীবনের অঙ্কের কি মিল ঘটায়নি?পিশাচ জন্ম নেওয়ার জন্য কি গতবার তোকে মন্ত্রমা বানায় নি?গতবারে, হতে পারলে,এবারেও হতে পারবি। অসুবিধে কি? শুধু অঙ্কগুলো ঠিকঠাক মেলাতে হবে। "

বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত ছিটকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো মিলি। "নাহ একদম না। আমি ফুলির জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে কিছুতেই আর মেলাবো না। অনল আমার স্বামী। আমার সব কিছু ও। আমার জন্য দ্বিতীয়বার ওর ক্ষতি হোক সেটা কিছুতেই চাই না। "

"ফুলির জীবনের সাথে তোর জীবন মেলাতে হবে, এ কথা তো আমি একবারও বলিনি। " কথাটা বলেই খেমি মা মিটিমিটি করে হাসছেন। মিলি এবার সত্যিই ধন্দে পড়েছে এই মহিলাকে নিয়ে। সব কথায় এত রহস্য কেন এনার?

মিলির অবস্থা বুঝতে পেরে, পাশের থেকে সেই ন্যাড়া লোকটি বলে উঠল,"মন্ত্রমা, কি শুধু ফুলি ছিল?শুধু তো ফুলি ছিল না। আসল মন্ত্রমা তো ছিল উলি... তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের অঙ্ক মেলালেও তো হবে। "

"মানে? কীভাবে?"

"তুমি ইতিমধ্যেই, একজনকে বাচ্চা বিয়োতে সাহায্য করেছ?"

মিলি মাথা নাড়াল, হ্যাঁ।

"অর্থাৎ তুমি দাই এর কাজে অংশ নিয়েছ। অর্ধেকটা মিল তুমি অযাচিত ভাবেই করে ফেলেছ। উলির মত তোমারও মেয়েই হয়েছে। এটা প্রকৃতির তৈরী মিল। এবার সব থেকে দরকারী মিলটা হল, উলির স্বামী উলিকে ছেড়ে গিয়েছিল। তোমার স্বামীকেও তোমায় ত্যাগ করতে হবে। অনলকে তোমায় ত্যাগ করতে হবে। আর এটা তুমি তৈরী করবে। "

মিলির মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো। অনলকে তাকে ত্যাগ দিতে হবে?সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অসম্ভব! সে অনলকে ছাড়া কীভাবে থাকবে?অনলের সঙ্গে তার ঝামেলা থাকতেই পারে, কথা বলা বন্ধ থাকতেই পারে, কিন্তু ছেড়ে চলে যাবে?এমনটা কখনোও সম্ভব? কখনওই না।

মিলি,গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, "অনল আমায় কখনওই ত্যাগ দেবে না। এটা কোনমতেই সম্ভব না। "

"সম্ভব!" খেমিমায়ের স্বর এতক্ষণ পরে গম্ভীর হয়ে উঠল, "এটা সম্ভব। অনল তখনই তোমায় ছেড়ে যাবে, যখন তুমি অনলকে সত্যি কথাটা জানাবে। "

মিলির গলাটা এবার কেঁপে উঠল, "সত্যি? কোন সত্যি?"

"যে সত্যিটা তুমি লুকিয়েছ, অনলের থেকে। আমাদের প্রত্যেকের থেকে। "

মিলি সরাসরি তাকালো খেমি মায়ের মুখের দিকে। খেমি মায়ের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মিলির ভেতর পর্যন্ত,দেখে নিচ্ছে যেন। মিলি জানে না, এই মহিলার ক্ষমতা রয়েছে,পেটের ভেতর থেকে গোপন সত্যিটা টেনে বের করার।

"তুমি,সেদিন তখনই বাড়ি ফিরে আসোনি, যেদিন নিজের সন্তানকে মাদুবাবার কাছে রেখে এসেছিলে। তুমি আবার ফিরে গিয়েছিলে পরে, কি হয় সেটা দেখার জন্য। কী আমি ঠিক বলছি তো?"

"তুমি,সেদিন তখনই বাড়ি ফিরে আসোনি, যেদিন নিজের সন্তানকে মাদুবাবার কাছে রেখে এসেছিলে। তুমি আবার ফিরে গিয়েছিলে পরে, কি হয় সেটা দেখার জন্য। তুমি ওদের পিছু পিছু গিয়েছিলে, যেখানে মাদুবাবা তোমার সন্তানকে নিয়ে জীবন্ত কবরে সমাধিত হয়েছিল। তুমি সবটা দেখেছিলে, আড়াল থেকে। সবটা। সবটা শুনেও ছিলে,সেদিন ওদের কথা। তাই তুমি আবার তিনদিন পরে গিয়েছিলে। তুমি মঙ্গলাকে নজর রাখছিলে আড়াল থেকে,কিন্তু তুমি বুঝতে পারোনি, ওখানে কি অপেক্ষা করছিল। মঙ্গলাকে যে জিনিসটা গর্তের ভেতরে টেনে নিয়েছিল, সেটাকে তুমি দেখতে পাওনি,ঠিকই, কিন্তু তুমি মঙ্গলার আর্তনাদ শুনে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলে। কী?ঠিক বলছি তো? এই কথা গুলোই তুমি তোমার স্বামীকে বলবে।"

মিলি দেখল, একমাত্র খেমি মা ছাড়া,উপস্থিত সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছ। এমনকী কমলা পর্যন্ত।

"কেন মিলি? কেন এমন করলে?এই সত্যিগুলো কেন লুকোলে আমার থেকে?" ঘোষাল জেঠিমা,নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মিলি ঘাড় নিচু করল। গলা শুনে মনে হল, একটা দলা পাকানো কান্নার ঢেউ, তার গলার কাছে আটকে রয়েছ। "হ্যাঁ, আমি ছিলাম। আমি সবটা দেখেছিলাম। কিন্তু কাকে বলবো?সবাই আমায় খারাপ ভাবতো। যে মা, নিজের সন্তানের মৃত্যু দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সে মা কে সবাই খারাপ ভাবে। ভাবেই। কিন্তু আমি তো ওটা নিজের জন্য..."

মিলির কথাটা শেষ হল না, তার আগেই,ওদের পেছন থেকে, একটা বজ্রকণ্ঠ ঘোষিত হল,"নিজের সন্তানের মৃত্যু দেখে, মানে?"

চমকে সবাই সেদিকে তাকাতেই, দেখা গেলো,মিলির বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অনল। পরনে অফিসের ভিজে পোশাক। বোঝাই যাচ্ছে,ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজেছে সে। সদর দরজাটা যে আলগা ছিল, সেটা মিলি খেয়াল করেনি। অনল কখন যে, বাড়িটে ঢুকেছে সেটাও না। জানলে সে অবশ্যই সতর্ক হত। এখন তো সেই সুযোগ ও নেই।

******

ড্রইংরুমে সকলেই দাঁড়িয়ে রয়েছ, একমাত্র খেমি মা ছাড়া। তিনি চেয়ারে বসে রয়েছেন চোখ বন্ধ করে।

মিলি মাত্র, নিজের পুরো কথাটা শেষ করেছে অনলের সামনে। আর অনল প্রচণ্ড রাগে, ফুঁসছে যেন।

"অনল,অনল আমায় প্লিজ ক্ষমা করে দাও। আমি চেয়েছিলাম, তোমায় সবটা বলতে,কিন্তু তুমি অসুস্থ ছিলে..."

কথা শেষ করতে পারলো না মিলি, ওমনি ছুটে এসে,অনল মিলির গলা টিপে, পেছনের দেওয়ালে ঠেসে ধরল। তারপর প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে উঠল, "শয়তান, মেয়েছেলে! আমি তোমায় খুন করে ফেলব। " কথাটা বলতে বলতেই,প্রচণ্ড আক্রোশে, নিজের শক্ত হাতটা,মিলির টুটির ওপর সাড়াশির মত চেপে ধরল। আর সাথে সাথে দম নিতে না পেরে, মিলির সারা মুখ লাল হয়ে উঠল।

ঘোষাল জেঠিমা আঁতকে, উঠলেন। "এ কী করছ বাবা! ছেড়ে দাও। ও মরে যাবে তো "

"মরে যাক! এর মরে যাওয়াই উচিত। যে নিজের সন্তানকে, এক ভণ্ড তান্ত্রিকের কথায় বলি দিতে পারে, তার মরে যাওয়া উচিত। কারণ সে মা নয়,সে ডাইনি। "

পাগলা আর উপায়ন্তর না দেখে, অনলকে পেছন থেকে সজোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলো। আর তাতে, অনল মিলিকে ছেড়ে দিলেও,নিজে হুমড়ি খেয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেলো। আর পড়েই, হাউমাউ করে মেঝের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগলো।

ওদিকে মিলি ভয়ঙ্কর ভাবে কাশছে। অনল সত্যিই তার গলাটা ভয়ঙ্কর ভাবে চেপে ধরেছিল।

জেঠিমা অনলের পিঠে হাত বোলাতে বলাতে বলে উঠল, "শান্ত,হও বাবা। শান্ত হও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু শান্ত..."

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই অনল জেঠিমার হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো, গায়ের ওপর থেকে।

"সরে যান। সরে যান। আমার কাছ থেকে। আপনারা যত নষ্টের মূল। আপনারাই এসব বলে বলে ওর মাথাটা খেয়েছেন। এইসব,পিশাচ, মন্ত্রমা,তাবিজ, কবজ। আমার মিলি তো এরকম ছিল না। সে এত কুসংস্কারী কবে হল? এই মিলি আমার অচেনা। একে আমি চিনি না। "

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো অনল। তারপর মিলির দিকে তাকিয়ে মুখ থেকে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল, মিলির গায়ে। "তোমায়?তোমায় আমি ত্যাগ দিলাম মিলি। তোমায় আমি ভালবেসে ছিলাম মিলি। কিন্তু আজ তোমার মত মানুষের মুখ দেখতেও ঘেন্না হচ্ছে। আমি এক মুহূর্ত তোমার সঙ্গে থাকবো না। তুমি খুব তাড়াতাড়ি ডিভোর্স এর কাগজ পেয়ে যাবে। খারপোশ চাইলে পেয়ে যাবে। কিন্তু এই জীবনে আমি আমার সঙ্গে তোমার নাম শুনতে চাই না আর। "

কথাটা বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না অনল। দড়াম করে দরজাটা লাগিয়েই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। তারপর অন্ধকার চাইপাটে, অথবা মিলির জীবন থেকে সে হারিয়ে গেলো চিরদিনের জন্য। মিলিকে একলা করে দিয়ে।

ওদিকে মিলির চোখে যেন জল নেই। অনল যে তাকে সত্যি সত্যি ছেড়ে চলে গেল? এটা সে নিজে এখনই অনলের মুখ থেকে শুনল, কিন্তু সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছ ভেতরে ভেতরে। উপস্থিত সকলে মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু মিলি চুপ।

এমন সময় খেমি মা, বিড়বিড় করে বলে উঠলেন,"সত্য কখনো চাপা থাকে না মেয়ে। সত্য বেরিয়ে আসেই। আর যা থাকে কপালে, সেটাও কখনো খণ্ডন করা যায় না। "

"অনল আমায় ভুল বুঝল মা, অনল আমায় ভুল বুঝল। কিন্তু আমার কী দোষ?আমি সকলের মত মাদুবাবাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আমি ভেবছিলাম,তিনদিন পর, তিনি বেঁচে ফিরলে,তিনি সব ঠিক করে ফিরবেন। আমার মেয়েও হয়তো ঠিক হয়ে ফিরে আসবে। আমি তার হাতে নিজের সন্তান তুলে দেওয়ার সময় এই একটাই অনুরোধ করেছিলাম...। "

মিলির কথা শুনে খেমি মা, অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন," মাদুবাবা, তোর কথা কেন শুনবে?কেনই বা ফিরবে? সে যে জন্য তোর মেয়েকে চেয়েছিলেন,সেই কাজ তো তার হয়ে গিয়েছে। সেই জন্যই তো এতদিন সে

মাদুবাবা সেজে অপেক্ষা করছিল সঠিক সময়ের। এই জন্যই তো সে,মন্ত্রমা যে খারাপ সেই গল্প রটিয়ে এসেছে এতদিন ধরে। সে তো সব সময়ই চেয়ে এসেছে পিশাচ জন্ম নিক। তাই তো গর্ভবতীদের তাবিজ দিয়ে এসেছে মন্ত্রমাকে আটকানোর। আর পিশাচ তো যার তার গর্ভে জন্ম নেবে না। তাকে হতে হবে বুদ্ধিমতি। আর সেটা যাচাই এর জন্যই তো সরাসরি কী করতে হবে, না বলে, ধাঁধার মধ্যমে কথাটা বলতো,যাতে বুদ্ধি আছে এমন মহিলাই ধাঁধার অর্থ বের করতে পারে,আর পিশাচের জন্ম দিতে পারে। ধারণ, ধরি, ধরব,ধরা/ শুনতে লাগে ভিন্ন না। যারা ধাঁধার অর্থ বের করতে পারেনি,তাঁরা তাগা খুলে দিয়েছিল। মন্ত্রমা, এসে বাছা নিয়ে গিয়েছ। কিন্তু তুই পেরেছিলি। তাই মিলির গর্ভেই পিশাচ জন্ম নিয়েছিল। “

“তার মানে?” ঘোষাল গিন্নির মুখ বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল যেন।

“মাদুবাবা একজন সিদ্ধ তান্ত্রিক। খারাপ তান্ত্রিক বলতে পারিস। এর উদ্দেশ্য ছিল ভয়ঙ্কর। মাদুবাবা, এখানেই। এই চাইপাটেই থাকত। তখন নাম ছিল মাকড়ি বাবা। “

****

চোখের সামনে দাউদাউ করে বাড়ীটা জ্বলছে।

লেলিহান শিখা যেন দুঃসহ স্পর্ধায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলতে চাইছে। সর্বগ্রাসী লালচে আগুণের ওম... বাড়ীটা থেকে অনেকটা তফাতে পড়ে থাকা ফুলির সারা সারা শরীরে যেন তাপ ধরাচ্ছে। মাটির ওপর মৃতদেহের মত নির্জীব হয়ে পরে রয়েছে ফুলি। অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রয়েছে সেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা বাড়ির দিকে। যে বাড়ির ভিতর থেকে একটু আগেও তার স্বামী লোকনাথ কবিরাজের মরণ চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। এখন সব চুপচাপ। একপাল লোক একটু আগেই তাকে, টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে, তার স্বামী সহ পুরো বাড়ীটা আগুন লাগিয়ে দেয়। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে দেখতে চোখের সামনে পুরো বাড়ীটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠে। গলা দিয়ে আর্তচিৎকারটুকু বের করার সময় পায় না সে। ওদিকে

https://boierpathshala.blogspot.com

ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসতে থাকে, ফুলির স্বামীর বাঁচাও! বাঁচাও! রব। না কেউ বাঁচায় না। ফুলি অবাক চোখে দেখতে থাকে, সেই একপাল দুষ্কৃতীর নারকীয় উল্লাস। কিন্তু কারা? কারা এরা? যারা তার এতো বড় সর্বনাশ করল? উত্তর পেতে দেরী হল না। এতজনের মধ্যে একজনের মুখে ঢাকা দেওয়া গামছা খানা খসে পড়তেই, বিস্ময়ে হতবাক হল ফুলি। বিসম্ভর প্রামাণিক? তাঁদের গ্রামেরই একজন মাথা। তখন ফুলির... চোখের সামনে পুরো ঘটনাটাই ছবির মত ধরা পড়ল।

কয়েকদিন আগেই সে জানতে পেরেছিল, কিছুদিন আগে তার যে গর্ভপাত হয়েছিল, তার পেছনে ছিল এই গ্রামেরই লোকেদের ষড়যন্ত্র। এটা জানতে পেরে, ক্রোধে, দুঃখে, বিশ্বাসঘাতকতায় কাতর ফুলি পণ নিয়েছিল, যে সে আর কখনওই কারো সন্তান প্রসবে সাহায্য করবে না। এমনকী মহাজনের বউমার প্রসবকালীন ডাকও সে উপেক্ষা করেছিল এই একই কারণে। অনেক হুমকি, শাসানির মুখে দাঁড়িয়েও সে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। নাহ, যে গ্রামের লোকদের বউ সন্তানদের বাঁচানোর জন্য সে প্রাণপাত চেষ্টা করে গিয়েছিল, তাঁরাই কিনা নিজেদের স্বার্থের জন্য তার গর্ভের সন্তান হত্যা করেছে। নাহ, এই বিশ্বাসঘাতকদের আর কোনো সাহায্য নয়। ফলত যা হওয়ার তাই হয়েছিল। প্রসবকালীন জটিলতায় মারা গেলো মহাজনের বউমা আর তার পেটের সন্তান। আর মারা যেতেই মহাজন হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। আজ এই ভয়ঙ্কর ঘটনা তারই যে প্ররোচনায় তা নিয়ে আর সন্দেহ রইল না ফুলির।

সে দেখতে পেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আততায়ীর দল, আচমকা অন্ধকারে যেন মিশে গেলো। তাঁদের কাজ হয়ে গিয়েছে এখানে আর তাঁদের থেকে কী কাজ। জায়গাটা পাণ্ডববর্জিত হয়ে পড়া মাত্রই... আচমকা ফুলি টের পেল, তার তলপেটে অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন ধারালো কিছু দিয়ে তার ঠিক তলপেটের নীচটা একটু একটু করে চিরে দিচ্ছে।

facebook.com/boierpathshala.official

এই যন্ত্রণার মধ্যেও ফুলি আঁতকে উঠল প্রায় অজানা আতঙ্কে। দাইয়ের কাজ করছে কম দিন হল না তার...। অভিজ্ঞ ফুলি জানে, এ কীসের লক্ষণ। কিন্তু? সে তো মাত্র সাতমাসের গর্ভবতী। তাহলে এখনই? ফুলি টের পাচ্ছে, জল ভাঙছে তার, নাহ সে এটাকেও বাঁচাতে...

তীব্র একটা প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার আর ফুলির মনে হল ঠিক দু পায়ের মাঝে কেউ যেন ধারালো কিছু দিয়ে ছিঁড়ে খুবলে শেষ করে দিচ্ছে তাকে। আর ঠিক তারপরেই ফুলি জ্ঞান হারাল।

*****

কয়েকমুহূর্ত আগেই তার জ্ঞান ফিরেছে। আর সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জ্বলতে থাকা বাড়ির দিকে। সে বুঝতে পেরেছে, এই মুহূর্তে সব শেষ হয়ে নিঃস্ব সে। জ্বলতে থাকা বাড়ির মধ্যে তার স্বামীর দেহ এতক্ষণে পুড়ে নিশ্চয়ই ছাই হয়ে গিয়েছে। আর একটু আগেই যা হল, তার ফল সে ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছে। দুপায়ের ফাঁকের মাঝে পড়ে রয়েছে রক্ত আর রসে মাখামাখি এক সদ্যজাতের মৃতদেহ। ফুলির নাড়িখানা এখনও যুক্ত রয়েছে সেই শিশুর সঙ্গে। ঘাড় উঁচিয়ে ফুলি দেখল, সেই ছোট্ট মাংসপিণ্ডে খুব ক্ষীণভাবে এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে। হয়তো আর কয়েকমুহূর্ত। তারপরেও এই সদ্যজাতের প্রাণবায়ু হয়তো বেরিয়ে যাবে...

ঠিক এমন সময় পায়ের দিকে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কারো হেঁটে আসার শব্দ শুনে চমকে উঠল ফুলি। ওরা? ওরা কী আবার ফিরে আসছে? এবার? এবার কী তাকে শেষ করবে? বেশ, করে দিক তাকে শেষ। সে আর বাঁচতে চায় না। চায়না সে বাঁচতে। এতক্ষণ সে, চুপ করে থাকলেও এবার যেন একটা কান্নার দমক ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগলো কিন্তু আচমকাই জ্বলতে থাকা বাড়ির আভায় একটা দেহের অবয়ব ফুটে উঠতেই, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই ছাই ভস্মমাখা সন্ন্যাসী। মাকড়িবাবা। সেই মাকড়িবাবা, যে তার মাকে মারতে চাইছিল তারই চোখের সামনে। সে এখন

দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলির অবসন্ন, ক্লান্ত দেহের দুহাত দূরত্বের মধ্যে। কী চাই এর? এখানে কেন এসেছে? ফুলি দেখল মাকড়ি বাবার হাতে, একটা কোদাল গোছের কিছু। সাধারণত মাটি কোপানো হয় তাতে। কিন্তু? এটা কেন এনেছেন উনি? ফুলি বুঝতে পারল না মাকড়ি বাবা ঠিক কী করতে চাইছেন? ফুলির সন্দিহান মুখের দিকে তাকিয়ে মাকড়িবাবা একটা উপহাসের হাসি হাসলেন।

তারপর ঠিক ফুলি যেখানে শুয়েছিল ঠিক তার থেকে হাত দশেক দূরে একটা জায়গায় মাটি খুঁড়তে লাগলো। ফুলি ওইরকম অবস্থাতেও অবাক হয়ে দেখছে মাকড়িবাবার কাজ। কী করতে চলেছে এই সন্ন্যাসী?

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা হাত দেড়েকের গর্ত খুঁড়ে কোদালটা একপাশে নামিয়ে রেখে মুখের থেকে একদলা থুতু সেই গর্তের মধ্যে ফেললেন তিনি। আর তারপরে বিড়বিড় করে আজানা ভাষায় কী যেন একটা মন্ত্র পড়লেন। আগুণের আলোয় ফুলি দেখছে, প্রৌঢ়ের পেটানো চওড়া বুকখানা হাপরের মত ওঠানামা করছে।

মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই, ধীরে ধীরে কোমরে পেছনে গুঁজে রাখা একটা কাস্তে, বের করে ফুলির দিকে এগিয়ে এলেন মাকড়িবাবা । তারপর ঠিক তার পায়ের কাছে বসেই সদ্যজাত অঙ্গে ফুলির যোগসূত্র সেই নাড়িখানা সেই কাস্তে দিয়ে কেটে দিতেই একটা চিনচিনে ব্যাথায় মাথাখানা ঝিমঝিম করে উঠল ফুলির। আর সেই অবস্থাতেই সে দেখলো, মাকড়িবাবা রক্ত আর রসে মাখামাখি হওয়া সেই সদ্যজাত কে তুলে ধীরে ধীরে সেই খোঁড়া গর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

“কোথায়? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওকে? ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?”

এক ভয়ঙ্করের দুরাশায় কোনোরকমে উঠে বসবার চেষ্টা করলো ফুলি। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে এখনো বাচ্চাটা মরে যায় নি। মাকড়িবাবা কী সেটা বুঝতে পারছে না।

“ওকে নিয়ে কী করবে? কী করবে ওকে নিয়ে? ও এখনো বেঁচে আছে। ওকে কী...”

কথাটা শেষ করবার আগেই ফুলি দেখল মাকড়িবাবা সেই সদ্যজাত কে গর্তের ভেতরে নামিয়ে রাখলেন। তারপর ফুলির দিকে ফিরে একটা নারকীয় হাসি ঠোঁটের ডগায় রেখে বললেন,

“যেদিন তোর জন্ম হয় আমি সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, তুই হলি সেই মানুষ সে আমায় পিশাচশ্রেষ্ঠ হতে সাহায্য করবি। তোর গর্ভের তৃতীয় সন্তান ভয়ঙ্কর পিশাচ লক্ষণ যুক্ত। তার মত ভয়ঙ্কর পিশাচ বিগত কয়েকশতকে জন্মেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে পিশাচ তোর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়ায় মানবদেহে আবদ্ধ। তাই তাকে এই দেহ থেকে মুক্ত করতে হবে। একবার এই দেহ থেকে মুক্ত হলেই। সে জন্ম নেমে এই ভূমিরই কোন নারীর গর্ভ থেকে। আর একবার সে জন্ম নিলেই শুরু হবে আসল পিশাচ খেলা। ঠিক তখনই তাকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারলেই আমি হয়ে উঠব পিশাচশ্রেষ্ঠ। তখন আমার ক্ষমতা হবে ঈশ্বরের সমতুল্য। “

ফুলি হাঁ হয়ে পুরোটা শুনছে। সে এখনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একটানা কথা বলে একহাতে কোদালটা তুলে নিলেন মাকড়িবাবা। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "বীজ না পুঁতলে, গাছ জন্মাবে কেমন করে। জ্যান্ত অবস্থাতেই তো পুঁততে হবে রে তাকে। যত কষ্টে মরবে সে, পিশাচ তো ততো ক্ষমতা নিয়ে জন্মাবে। আর সেটাই তো আমি চাই।কথাটা বলেই ঝপাঝপ করে গর্তে মাটি ফেলতে লাগলেন মাকড়িবাবা। কিন্তু চুপ করে নয়। একএকটা কোদাল মাটির সাথে সাথেই ঠোঁটের কোলে বেরিয়ে আসছে অদ্ভুত একটা মন্ত্র। সে মন্ত্রের শব্দ ফুলির অজানা। এদিকে ফুলি যেন পাথর হয়ে সবটা দেখছে। সে বুঝতে পারছে না, আজ তার সাথে ঠিক যা যা হচ্ছে, তা সত্যি? নাকি অলীক স্বপ্ন? আর এই মাকড়িবাবা যা যা বললেন, সেগুলোই বা সত্যি হয় কেমন করে..

হাতের কাজটা শেষ করে, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাকড়িবাবা। তারপর, ধীরে ধীরে কোমরে গুঁজে রাখা কী একটা গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস বের করে ছড়িয়ে দিলেন সেই সদ্য বুজিয়ে ফেলা গর্তের ওপর। চোখে মুখে এক অদ্ভুত কুটিল নারকীয় উচ্ছ্বাস।

পুরো কাজটা শেষ করে, মাকড়িবাবা ধীর পায়ে হাঁটুমুড়ে এসে বসলেন, ফুলির কাছে।

ফুলি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, মাকড়িবাবার মুখের দিকে। একটা শিশুকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার পরেও কী অবিচল তার মুখের প্রত্যেকটা পেশি।

"পুরো কাজটা শেষ করার জন্য, আমায় অনেকটা সময় দিতে হয়েছে। আর অনেকটা পরিকল্পনা করতেও হয়েছে। এই যে তোর গর্ভপাত, মহাজনের বউমার মৃত্যুর পর গ্রামের লোকদের তোর স্বামীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা। সব করতে হয়েছে। পরিকল্পনা করে। "

"তুমি? তুমিই তারমানে গ্রামের লোকেদের খেপিয়ে তুলেছিলে? তোমার জন্যই ওরা আমার স্বামীকে স্বামীকে জ্যান্ত..."

ফুলি কথাটা শেষ করতে পারলো না, তার আগেই মাকড়িবাবা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

"ঠিক ধরেছিস, আমিই করেছি সব। শুধু আর শুধুমাত্র, তোর গর্ভের ওই পিশাচ সন্তানের জন্য। ওই···ওই যে দেখ, ওখানে..." কথাটা বলেই মাদুবাবা আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল সেই শিশু কবরের দিকে।

"এতক্ষণে, সেই পিশাচ, মানব দেহ থেকে মুক্ত হয়ে চাইপাটের পঞ্চভূতে বিলীন হয়েও গিয়েছে। এখন এখানকারই কোন নারীর গর্ভে তার জন্ম নেওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। " কথাটা বলেই তিনি ফিরে তাকালেন, ফুলির দিকে, " কিন্তু তোকে আজ এতোসব কেন জানাচ্ছি জানিস? কারণ আমার কাছে তোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। পিশাচ কে আটকানোর ক্ষমতা

তো দূর, কিছুই করবার ক্ষমতাই আর নাই তোর। চাইপাটে তোর ভূমিকা ফুরিয়েছে। “

পুরো কথাটা শুনে, একবার চোখ বন্ধ করে, জোরে একটা শ্বাস নিলো ফুলি। তারপর মাকড়িবাবার চোখে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “আমি কে জানো? আমি মন্ত্রমা। এই চাইপাটের মন্ত্রমা। আমি কিছু করতে পারিনি এটা যেমন সত্যি, আবার অনেক কিছু করতে পারি এটাও সত্যি। এই মাটিতে আমার ভূমিকা কখনো শেষ হবেন না। কক্ষনো না...”

কথাটা বলে সাথে সাথে একহাতে ধরা কাস্তে খানা দিয়ে সে একটা কোপ বসালো মাকড়ি বাবার ঘাড়ের ডানদিকে। এই কাস্তে খানা মাকড়িবাবারই এনেছেন । এই কাস্তে নিয়েই ফুলির নাড়ি কেটেছিল সে, এখন এই কাস্তেই সে বসিয়ে দিয়েছে মাকড়ির ঘাড়ে। সাথে সাথে একটা প্রবল আর্তনাদ বেরিয়ে এলো মাকড়ির মুখ থেকে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে মাকড়ির ঘাড় থেকে। সে দুহাত দিয়ে নিজের ক্ষতটা চেপে ধরে একপাশে লুটিয়ে পড়ল।

ওদিকে ততক্ষণে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফুলি,সারা শরীর ভিজে গেছে, প্রসব কালীন রক্তে, রসে, জলে। ফুলি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলো সেই শিশুর কবরের দিকে। একপাশে পড়ে থাকা কোদাল খানা তুলে, সেই দুর্বল শরীরেই কোপাতে থাকলো কবরের মাটি।

ওদিকে মাকড়িবাবার অবস্থা করুন। অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও তিনি বিস্ফারিত নয়নে দেখছেন ফুলিকে। আগুণের আলোয়, এলো মেলো শাড়িতে খোলা চুলে তার এই মাটি কোপাতে থাকা রূপ যেন ব্রহ্মময়ীর বিধ্বংসী রূপের প্রতিরূপ।

মাকড়িবাবা দেখলেন ফুলি, কোদালটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দুহাতে মাটি সরিয়ে গর্তের ভেতর থেকে তুলে আনলো সেই মৃত সদ্যজাত কে। হ্যাঁ, মারা গিয়েছে ফুলির সন্তান। মাকড়িবাবার কথা মত সেই পিশাচ, যে কিনা চাইপাটের পঞ্চভূতে মিশে অপেক্ষা করছে জন্ম নেওয়ার।

ফুলি তাকালো মাকড়িবাবার দিকে। সেই চোখে অপরিসীম ঘৃণা।

"আমি ফুলি। এই চাইপাটের মন্ত্রমা। তুই এই পিশাচ কে মেরেছিস, যাতে সে, নতুন করে জন্মনিতে পারে তো? কিন্তু কী হবে যদি কখনওই এই মাটিতে আর নতুন করে কোন সন্তান না জন্ম নেয়? তখন?"

"কী? কী করতে চলেছিস তুই?" গলা থেকে একটা ফ্যাস্ফেসে স্বর বেরিয়ে এলো মাকড়িবাবার।

"আজকের পর থেকে, এই মাটিতে কোনো নবজাতক জন্ম নেবে না। আমি মন্ত্রমা কাউকে এখানে জন্ম নিতে দেব না। এই পিশাচকে আটকানোর জন্য আমায় যত খারাপ হতে হয় আমি হব। তুই যেমন এই পিশাচকে মানবদেহ থেকে মুক্ত করে শক্তিশালী করেছিস। আমি নিজেকে মুক্ত করে দেব এই পিশাচকে আটকানোর জন্য। "

কথাটা বলেই সে নিজের সদ্যমৃত শিশুটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল, জ্বলতে থাকা বাড়ির দিকে,

"কোথায় যাচ্ছিস? কোথায় যাচ্ছিস ওকে নিয়ে..." বিস্ফারিত নয়নে, ফুলির দিকে তাকিয়ে থাকা মাকড়িবাবার গলা থেকে বেরিয়ে এলো ভয়মাখা একটা ফ্যাস্ফেসে স্বর।

কিন্তু ফুলি সেই কথার জবাব না দিয়ে, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো, সেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা বাড়ির দিকে...। ততক্ষণে মাকড়িবাবার কানে এসে পৌঁছেছে, একটা রিনরিনে সুরের ছড়া। দুচোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে তিনি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনতে পেলেন সেই চড়ার শব্দ।

"উলি উলি উলি/উলির বেটি ফুলি

ফুলির পেটে ছা/ ছা এর কপাল খা। "

****

"কিন্তু মাকড়ি যে উদ্দশ্যে অপেক্ষা করছিল এতদিন, সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আসলে পিশাচতন্ত্র এত সহজ নয়। এই পিশাচ যে কত শক্তিশালী সে বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিল,এই পিশাচকে নিজের মধ্যে ধারণ করে, দেহত্যাগ করলে,সে পিশাচ শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। কিন্তু এই শক্তিশালী পিশাচ তাকে বানিয়ে ছেড়েছে,এক ভয়ঙ্কর অপশক্তি। যা থাকে ওই পিশাচেরই অধীনে। "

একটানা এতোটা কথা বলে হাঁপাচ্ছিল খেমি মা। মিলি হাঁ হয়ে পুরো কথাটা শুনল। সে একদমই প্রস্তুত ছিল না এই ধরনের কাহিনী, শুনবার জন্য। পুরোটা শুনে,তার পায়ের তলে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

"মাদুবাবার গলার স্বর ফ্যাস্ফেসে ছিল কী ওই, ফুলির করা কাস্তের আঘাতের জন্যই?"

ঘোষাল গিন্নির, প্রশ্নে, খেমি মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই, জায়গাটা জুড়ে নেমে এলো,এক নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর খেমি মা ই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন,"এই মেয়ে, শোন। আমাদের কাজটা অনেকটা কঠিন । কিন্তু তার চেয়েও কঠিন তোর কাজটা। তোর কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। হাল ছাড়লেই..."

কথাটা শেষ হল না তার আগেই,মিলি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, " এইটা জুয়া খেলা চলছে খেমি মা। আর এই জুয়া খেলায় আমার কাছে হারার মত আর কিছুই নেই। আমার সবটুকু বাজী রেখেছি এই খেলায়। তাই হাল ছাড়ার আর প্রশ্ন নেই। কোনো প্রশ্ন নেই। "

****

জঙ্গলের পথ ধরে, ওরা চারজন হাঁটছে। সারাদিন আজ বৃষ্টি। জঙ্গলের সুরকি পথ কাদায় ঘেঁটে রয়েছে। বৃষ্টি থমেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু পাতা থেকে টুপটাপ জল ঝরে পরার,শব্দ, ওরা চলতে চলতেও শুনতে পাচ্ছে। সেই সঙ্গে নিরবিচ্ছন্ন ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। রাত্রে,জঙ্গলের নাকি নিজস্ব একটা

শব্দ থাকে। সেই শব্দ কোথাও যেন আজ ঢাকা পরে গিয়েছে,এই বর্ষণ সিক্ত চরাচরে।

ওদের কাছে একটা টর্চলাইট আর একটা এমারজেন্সির আলো। সবার আগে আগে পথ দেখিয়ে হাঁটছে মিলি। খেমি মা জঙ্গলের এই পিছল পথে হাঁটতে পারবেন না,তাই তাকে কোলে তুলে নিয়েছে পাগলা নামের ভদ্রলোকটি। মিলি এদের দুজনের কী সম্পর্ক তা জানে না। এখন যা পরিস্থিতি, তা জানতেও আগ্রহী নয় সে। সম্ভবত মা ছেলে। সকলের পেছনে হাঁটছেন ঘোষাল গিন্নি। মিলির বাড়ির এমারজেন্সিটা দেহ রেখেছে একটু আগেই। তাই বাধ্য হয়ে ঘোষাল জেঠিমা, নিজের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে এই এমারজেন্সিটা নিয়ে এসেছেন। যদিও মিলি তাকে আজ আস্তে বারণ করেছিল। কিন্তু তিনি শোনেন নি।

বালিশ চাপা দেওয়ার ঘটনার পর পরই সেই শিশুটিকে দেখতে পাওয়া যায়নি। খেমি মা বলেছেন,শিশুটিকে দরকার। যে মানবরূপে সে জন্মনিয়েছিল, সেই রূপটি অক্ষত রয়েছে সেই কবরের মধ্যেই। আর যা মিলি এঁর অনলের সামনে এসেছে, তা তার শক্তির একটি কণা মাত্র। তাকে সেই কবর থেকে তুলে বের করে আনতে হবে। তাই ওরা সকলে মিলে, ওই কবরের ওখানে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতেই, অন্ধকার পথ বেয়ে ওরা এসে পৌঁছল সেই জায়গাতে যেখানে মিলি সেদিন মঙ্গলাকে, ওদের কবর দিতে দেখেছিল। কিন্তু একী?এখানে তো এখন বৃষ্টির জল জমে, পুকুরের আকার ধারণ করেছে।

পাগলা একটানা এতোটা পথ বয়ে খেমিমাকে নামিয়ে রাখল। সে ভয়ঙ্কর ভাবে হাঁপাচ্ছে।

“এই মেয়ে, কোথায় কবর ওদের?পথ হারিয়ে ফেলো নি তো?”

মিলি চিন্তান্বিত সুরে বলল, “ওরা যেই জায়গায় কবর খুঁড়েছিল,সেটা এই নাবাল জমিই ছিল। এখন তো জল জমে গিয়েছে দেখছি। “ মিলি

অন্যমনস্ক ভাবে টর্চের আলোটা জলের ওপরে ফেলল, আর সেটা প্রতিফলিত হয়ে উল্টোদিকে পড়তেই চমকে উঠল মিলি। একমুহূর্তে তার মনে হল, যেন উল্টোদিকে সে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, সাথে সাথে টর্চের আলোটাও নিক্ষেপ করল সেইদিকে, কিন্তু নাহ! কেউ নেই সেখানে। সে কী ভুল দেখল। নাকি সত্যি সত্যি কেউ ছিল। "

খেমি মা কিছু না বলে, ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন জলের ধারে, তারপর একহাতে পাগলা কে ধরে, ডানপায়ের একটা আঙুল সেই জলে ছোঁয়াতেই সাথে সাথে ছিটকে সরে এলেন তিনি।

"কী হল মা?" পাগলা উদ্বিগ্ন মুখে তাকালো,খেমিমায়ের দিকে। খেমিমা কিছু একটা বলতে গিয়েও কথাটা গিলে নিলেন যেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, জলের ঠিক মাঝখানে কবরটা খোঁড়া হয়ে রয়েছে। ওটাকে ডুবসাঁতার দিয়ে তুলে আনতে হবে পাগলা। পারবি?"

পাগলা একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলল, "পারবো। "

"আমাদের,দেরী করা চলবে না। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ সময় নেই। " কথাটা বলেই তিনি ফিরলেন মিলির দিকে।

তোর কাজটাই সবচেয়ে কঠিন। হিসেব মত মন্ত্রমা উলির সঙ্গে তোর জীবনের অনেকটা মিলে গিয়েছে এখন। তাই তুই আমাদের মন্ত্রমা। সেই ছড়াটা মনে আছে, যেটা মন্ত্রমা আউড়াতো?"

"উলি উলি উলি?"

"মনে,রাখ। এটাই তোর শক্তিমন্ত্র। তোর অস্তিত্ব এই ছড়াতেই। "

"আমায় কী করতে হবে?" মিলির মনে হচ্ছে কেউ যেন তার বুকের ভেতরে ড্রাম বাজাচ্ছে।

"একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে? এই পিশাচের জন্ম অতীতে হয়েছে। আর প্রভাব রয়েছে বর্তমানে। তাই একে এখান থেকে শেষ করা যাবে না।

একে শেষ করতে হলে, অতীতে যেতে হবে। কিন্তু সময় পরিক্রমা সাধারণ কেউ করতে পারে না। বিশেষ, ক্ষমতা লাগে। আমি সেই সময়টা সময়চক্রে পিছিয়ে দেখে এসেছি, যেই সময়টা পিশাচ জন্ম নিচ্ছে। আর কোন জিনিস একবার দেখে নিয়ে মনে রেখেদিলে, সেই দৃশ্যের অস্তিত্ব মৃত্যু পর্যন্ত থেকে যাবে। তোকে আমি সময়চক্রে ভ্রমণ করাতে পারবো না। তবে,সেই স্মৃতি ভাগ করে নেব যা আমি দেখেছি। তোমায় সেই স্মৃতিতে প্রবেশ করে, পিশাচ কে শেষ করতে হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে,যেই মুহূর্তে সে জন্ম নিচ্ছে। ব্যাস তোর কাজ ওইটুকুই। তোকে অতটুকুই করতে হবে। এই কাজটা করেই তুই ফেরত আসবি। পিশাচকে একবার অতীতে শেষ করতে পারলেই,তাকে জুড়ে থাকা, খারাপ কিছু আর কখনই তৈরি হবে না। তুই করতে পারবি তো এটা?"

কথাটা বলেই তিনি ফিরলেন, ঘোষাল গিন্নির দিকে," তুই এই অন্ধকারে, মাকড়িবাবার ডেরায় যেতে পারবি?"

জেঠিমা,সম্মতির সঙ্গে মাথা নাড়ালেন। "পারবো। "

বেশ!খেমি মা। নিজের নিজের পরনের মলিন কাপড়ের একটুকরো অংশ ছিঁড়ে। ডানহাত দিয়ে নিজের কপালের একটি আব নখ দিয়ে খুঁটতেই সেই আব থেকে সাদা রসের মত কী একটা গড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে,বিড়বিড় কী একটা বলতে বলতেই, কাপড়ের ছেঁড়া টুকরোটা তিনি চেপে ধরলেন,সেই রক্ত বেরোনো আব থেকে। কয়েকমুহূর্ত মাত্র। তিনি কাপড়টা সরিয়ে নিতেই সকলে অবাক হয়ে দেখল,কপালের সেই আব খানা, যেমন ছিল,ঠিক তেমনই রয়েছে। এদিকে,কাপড়ের টুকরোটা, যেভাবে রক্তে ভিজেছে,দেখে মনে হবে, অনেকটাই রক্ত বেরিয়েছে।

"মাকড়ি বাবার ডেরায় আগুন লাগাতে হবে। পারবি?"

ঘোষাল জেঠিমা, কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন,"পারবো। "

“বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা পাতা। তাই দাবানল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই কাপড়টা নিজে যা। “ কথাটা বলেই তিনি হাতের রক্ত, পুঁজ মাখা কাপড়টা বাড়িয়ে দিলেন ঘোষাল জেঠিমার দিকে।

“আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে বাড়িতে, তখন একমুহূর্ত দেরী না করে, এই কাপড়টা ছুঁড়ে দিস,সেই আগুণের মধ্যে। “

“এতে করে কী হবে?”

"এই কাপড়ের অন্য কাজ আছে। তুই যা। যা বললাম তাইই কর। আর হ্যাঁ, দ্রুত ফিরে আয়। আমি যখন এর সঙ্গে থাকবো, তখন এর শরীরও এখানে থাকবে। আমাদের সেটা রক্ষা করতে হবে। “

তারপরেই তিনি ফিরলেন লোকটির দিকে, পাগলা, তুই জলে নাম। মনে রাখ, একডুবে কিন্তু তুলে আনতে হবে। আর হ্যাঁ, তৈরী থাকিস। অনেক কিছু ঘটতে পারে। “

ঘোষাল জেঠিমা দেরী না করে অন্ধকার ঘরের ই একপাশের কুলুঙ্গির দিকে এগিয়ে গেলেন। কেরোসিন আর দেশলাই গোছের কিছু পেলেই তিনি নিজের কাজ শুরু করে দেবেন। কিন্তু কুলুঙ্গির কাছে এসে ঘোষাল গিন্নি অবাক। কই এখানে তো কিছু নেই। এই রে! এখন আবার এই ঘরে কোথায় রাখা আছে সেসব কী করে খুঁজবেন? অবশ্য বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসদুটো পাওয়া গেলো কুলুঙ্গির নীচের দিকের এককোণ থেকে।

ঘোষাল জেঠিমা, দ্রুত হাতে, ঢাকনা খোলা কেরোসিনের জ্যারিকেনটা একহাতে তুলে বিছানার ওপর ছেটাতে লাগলেন তিনি। বিছানাটা এখনো শুকনো রয়েছে। এই বিছানার আগুন ধরালেই অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে। তিনি অনেকটা কেরোসিন বিছানার ওপর ছিটিয়েই বাদবাকিটা ঘরের বাকী জিনিসপত্রের ওপর ছেটাতে লাগলেন। এই কাজটা সমাধা

করেই তিনি তুলে নিলেন স্যাঁতানো দেশালাই এই বাক্সখানা। মনে মনে প্রমাদ গুনলেন,ঘোষাল গিন্নি। মাত্র দুটোকাঠি। তায় আবার স্যাঁতসেঁতে। যদি না জ্বলে? কী হবে তখন?আচ্ছা খেমি মাই বা কেন এইঘরে আগুন লাগাতে বললেন? কী আছে এই ঘরে?ঠিক তখনই ঘরের অন্ধকার কোণে একটা চাপা ঘোঁতঘোঁতে আওয়াজ।

মুহূর্তে ঘোষাল জেঠিমার স্নায়ু শক্ত হয়ে উঠল। তিনি টের পাচ্ছেন তার হাত কাঁপছে। তাও কোনমতে,সেই কাঁপা কাঁপা হাতে, টর্চের আলোটা দরজার দিকে নিক্ষেপ করতেই,মুহূর্তে মনে হল, কেউ যেন আচমকা তার পেটের ভেতরটা টেনে খালি করে দিলো যেন। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে,একটা মহিলার শরীর। এ মহিলাকে তিনি চেনেন। এ মহিলা, মিলির প্রতিবেশী,মাধুরীর শাশুড়ি। মালতী জেঠিমা। যে জেলের লকআপের ভেতর থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু সে তো দরজার কাছে একলা নয়। তার সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরো তিনজন। যার মধ্যে দুজন পুরুষ। একজন মহিলা। এদের ঘোষাল গিন্নি চেনেন না। কিন্তু এদের মধ্যে দুজনের পুলিশি পোশাক বলে দিচ্ছে, এরা তাঁরা,যারা সেদিন, পুলিশ স্টেশন থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল।

আচমকা তাঁদের চেহারা গুলো বদলে যেতে লাগলো। ঘোষাল গিন্নি স্পষ্ট দেখতে পেলেন,মালতী সহ বাকীদের শরীরগুলো ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে। এতটাই লম্বাহচ্ছে,যেন তাঁদের মাথাগুলো ছাদ ছুঁয়ে ফেলবে। ঘোষাল জেঠিমার মাথা কাজ করছে না। কী করবেন তিনি এখন?পালিয়ে যাবেন? পালিয়ে যাবেন এখান থেকে?নাহলে এরা তো তাকে... তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, এ সেই পিশাচ যে একটু আগেই কমলার শরীরে প্রবেশ করেছিল।

ঠিক এমন সময়, শীতল বাতাসের একটুকরো তার কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যেতেই তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তার স্পষ্ট মনে হল, কেউ যেন তার কানে কানে বলে উঠল, আগুন! আগুন জ্বালো!

সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যে ঘোষাল জেঠিমা বুঝে গেলেন তাকে কী করতে হবে। তিনি টর্চলাইটা বগলে চেপে,দ্রুত দু হাতে দেশালই ঘসতে লাগলেন। জ্বালাতেই হবে। তাকে আগুন জ্বালাতেই হবে। খেমি মা এমনি এমনি বলেন নি কিছু... কিন্তু কী করে জ্বালাবেন! দেশালই তো জ্বলছে না। ওদিকে,চারচারটি দেহ, দ্রুত তাঁদের সেই ভয়ঙ্কর অবয়বে ফিরে আসছে। আচমকা,হাতের দেশলাই কাঠিটা, দুটুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল ভেজা মেঝেতে। যাহ! আর মাত্র একটা কাঠি?কিন্তু সেটাও যদি না জ্বলে? নাহ, এতকিছু ভাবার সময় নেই। তিনি দেশালাইএর বক্সের ভেতর থেকে বের করে আনলেন, শেষ কাঠিটা। এটাই তার শেষ ভরসা। ওদিকে ওরা একপা একপা করে এগিয়ে আসছে, ঘোষাল জেঠিমার দিকে,ঠিক এমন সময়, ফস করে একটা হলুদ আভা চিরিক করে জ্বলে উঠতেই,তিনি এঁর দেরী না করে, সেই জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে দিলেন কেরোসিন ভেজা বিছানার দিকে। মুহূর্তের জন্য মনে হল, কাঠিটা নিভে গেল বুঝি। কিন্তু ঠিক তার পর মুহূর্তেই,দপ করে, জ্বলে উঠল বিছানাটা। হলুদ আগুণের আভা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো বিছানা, বিছানা থেকে আশেপাশের জিনিসপত্রে। ভেজা স্যাতসেতে ঘর মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে উঠল, জতুগৃহ। ওদিকে ওই ভয়ঙ্কর চারখানা দেহ, কী করবে, বুঝতে না পেরে,ঘরের আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্বলন্ত বিছানার ওপরে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর আগুন নেভাবে তারা কেমন করে? সাথে সাথে সেই আগুণের ভয়ঙ্কর শিখা,ঘিরে ধরল তাঁদের। একটা ভয়ঙ্কর সম্মিলিত আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক। কিন্তু ঘোষাল জেঠিমা? তিনি বেরবেন কী করে এই ঘর থেকে, ঠিক এমন সময় পেছন থেকে আবার একরাশ শীতল হাওয়ার ধাক্কা। চমকে পেছন ঘুরলেন ঘোষাল গিন্নি, এই তো। এই তো পেছনের জানালা খোলা। বুকের ভেতরটা এখনো ভয়ঙ্কর ভাবে ধুকপুক করছে। একমুহূর্ত দেরী না করে তিনি এগিয়ে গেলেন পিছনের জানালা দিয়ে। তার নিজের বয়সও হয়েছে। কিন্তু এই জানালা দিয়ে লাফ দিয়েই তাকে পালাতে হবে। এছাড়া তো আর কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যেই অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে...। আর একমুহূর্ত দেরী নয়।

****

কাদার ওপর মুখোমুখি বাবু হয়ে বসে রয়েছে, খেমি মা আর মিলি।

এমারজেন্সির আলোটাএকপাশে নামিয়ে রাখা হয়েছে। ঘোষাল ডোবার ঠিক মাঝখান বরাবর তিনি টর্চের আলোটা নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই আলোর কেন্দ্রবিন্দুতে একহাঁটু জলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে,পাগলা। পায়ের ডানদিক বরাবর, একটা গর্ত টের পাচ্ছে পাগলা। খেমি মায়ের হিসেব মত,ওটাই সেই কবর। ওর ভেতরই একডুব দিয়ে, তুলে আনতে হবে,সেই শিশুর দেহ।

পাগলা শুধু অপেক্ষা করছে খেমি মায়ের নির্দেশে। সে ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে, বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে অদ্ভুত একটা বিকট গন্ধে। চারিদিকটা,আচমকাই বড় নিশ্চুপ লাগছে। যেন জঙ্গলের সমস্ত শব্দই থমকে গিয়েছে,এক মহারনের প্রতীক্ষায়।

খেমিমা, একবার মিলির দিকে তাকালেন, “তুই কিন্তু নিজের কাজ ব্যতীত আর কিছু করবি না। ভুল কিছু করলেই কিন্তু স্মৃতিতে আটকা পড়ে থাকবি সময়ের শেষ পর্যন্ত। তাই নিজের কাজ ব্যতীত আর কিছুই না। “ তারপরেই খেমি মা একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, “হয়তো, তোর সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। শুধু একটা কথাই বলবো এই যুদ্ধে জয়ী হলে, তুই যা যা হারিয়েছ তা সব ফেরত পাবি। সব। আর যদি হেরে যাস,তোর কী হবে আমি জানি না। তবে যাই কর, নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিস না। প্রচণ্ড অন্ধকারে যখন চোখ ঢেকে যাচ্ছে তখন তুই নিজে কী, সেটা আগে মন থেকে বিশ্বাস করিস। পুরোটাই বিশ্বাসের খেলা। তাই এই যুদ্ধে তোমায় জিততেই হবে। “

কথাটা শেষ করেই তিনি পাগলার দিকে ফিরে কী একটা ইঙ্গিত করতেই,পাগলা একমুহূর্ত দেরী না করে একটা ডুব দিলো, আর সাথে খেমি মা চেপে ধরলেন মিলির কপালের দুই পাশ। পলকমুহূর্ত মাত্র সময় আর

সাথে সাথে মিলির দেহটা,প্রাণহীন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, খেমিমায়ের কোলের উপর।

আঁতকে উঠল ঘোষাল জেঠিমা, "কী হল ওর?কী হল?"

খেমি মা ঘোষাল জেঠিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন,"কিছু হয়নি, তবে হবে। " কথাটা বলে,তিনি যেই পুকুরের উল্টোদিকের পাড়ে, নির্দেশ করলেন,সাথে সাথে সেই দিকে টর্চের আলো ফেলল, ঘোষাল জেঠিমা। আর তখনই দেখা গেলো একটা কালো শরীর,দু হাতে ভর দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। জিনিসটাকে দেখেই বুকের ভেতরটা আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো ঘোষাল গিন্নির। কিন্তু কিছু বলবার আগেই, জিনিসটা সড়াৎ করে জলে নেমে যেতেই,মিলিকে, কাদা মাটির ওপর শুইয়ে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালেন,খেমি মা।

আর তার উঠে দাঁড়ানো মাত্রই, দেখা গেলো,ঘোষাল জেঠিমার হাত থেকে টুক করে খসে পড়ল, টর্চলাইট খানা। খেমি মা দেখলেন,আচমকা ঘোষাল জেঠিমার শরীরটা ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে। ঠিক কমলার বদলে যাওয়া শরীরটার মত। আচমকা ঘোষাল জেঠিমা, সামনে পিছনে দুলতে শুরু করলেন। আর দুলতে দুলতে তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো,

"অদনবন্ধী বদনবন্দী..." "অদনবন্দী বদনবন্দী..." বারবার বারবার বারবার। খানিকটা উপহাসের সুরে। এই ছড়া বেঁধেই কমলার শরীর থেকে পিশাচমুক্ত করে বেঁধেছিলেন খেমি মা। কিন্তু সেটা ঘোষাল জেঠিমার শরীরে প্রবেশ করলো কখন? কোন সময়? তাও খেমি মা এর চোখ এড়িয়ে। মাদুবাবার ডেরাতেও তো আগুন লাগানোর সময় সবকিছু ঠিক ছিল। তাহলে? তাহলে কখন?

জানালা দিয়ে লাফ দিতেই, গোড়ালির নীচের দিকে একটা চোট পেলেন ঘোষাল জেঠিমা। কিন্তু তার তো থামা চলবে না। তাকে পালাতে হবে। পালাতে হবে জায়গাটা ছেড়ে। ঘরের ভেতরের লেলিহান শিখার উত্তপ্ত ওম বাইরে বেরিয়ে আসছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আগুণের লাল হলদেটে

আভা। সেই আভা জঙ্গলের অন্ধকারকে গিলে খেতে চাইছে। পিশাচ তাকে নাই মারুক। এখানে দাঁড়ালে এই বিধ্বংসী আগুন তাকে ঠিক মেরে ফেলবে। নাহ! আর না। তিনি টর্চের আলো ধরে, একপ্রকার লেংচে লেংচে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। কাদা মাটির ওপর সাবধানে কিন্তু দ্রুত এগোতে লাগলেন ঘোষাল জেঠিমা। খেমি মা কে গিয়ে বলতেই হবে, তিনি পেরেছেন। পেরেছেন তিনি আগুন ধরিয়ে...

কথাটা ভাবতে ভাবতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। পরক্ষনেই কোমরে গোঁজা একখানা কাপড় বের করতেই তার মনে পড়ল,আসল কাজটা তো বাকী রয়ে গিয়েছে। খেমি মা এর দেওয়া সেই,রক্তপুঁজ মাখা কাপড়টা। সেটা খেমি মা আগুনে ফেলতে বলেছিলেন,নিশ্চয়ই কোনো কারণে। উত্তেজনার চোটে, তিনি তো ভুলেই যাচ্ছিলেন কাজটা করতে...কথাটা ভাবতেই আর একটু সময় নষ্ট না করে ধীরে ধীরে সেই আবার সেই জ্বলন্ত বাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। বাড়ির কাছে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলেন,ঘরের ভেতরের আগুন ধীরে ধীরে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে। নাহ,দরজার কাছ থেকে দেওয়া যাবে না। বরং একটা কাজ করা যাক, যে জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছিলেন সেই জানালা গলিয়েই কাপড়ের টুকরোটা ভেতরে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে?মাথায় কথাটা আসা মাত্রই তিনি সাথে সাথে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন,ভিতর থেকে তখনও ভেসে আসছে, সেই চারটা দেহের মরণ চিৎকার। ঘোষাল জেঠিমা,কাপড়টা জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেন, কাপড়ের টুকরোটাকে জ্বলন্ত ঘরের ভেতর পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলার জন্য, কিন্তু ঠিক তখনই,ঘরের ভেতর থেকে খপ করে চেপে ধরল তার হাত খানা।

শিউরে উঠলেন ঘোষাল জেঠিমা। কিন্তু আর্তনাদ করে পালানোর পথ পেলেন না। জানালার ভেতর থেকে একটা সজোরে হ্যাঁচকা টান। আর সাথে সাথে তার দেহটা, কেউ যেন জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে টেনে নিলো।

আর মুহূর্তের মধ্যেই সব চুপচাপ। শুধু ঘরের ভেতর থেকে আগুনে জিনিসপত্র পোড়ার চড়চড় শব্দ। সেই নীরবতা স্থায়ী রইল কয়েকমুহূর্ত সময়। আর তারপরেই আচমকা,মাদুবাবার জ্বলন্ত ঘরের ভেতর থেকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এলো একটা নারী শরীর। যার পাকা চুলের সিঁথির মাঝে জ্বলজ্বল করছিল, লাল সিঁদুর। হ্যাঁ,ঘোষাল জেঠিমা। সেই এক শরীর, পার্থক্য শুধু দুটো। একটু আগেও যেভাবে ল্যাংচে ল্যাংচে হাঁটছিলেন, সেটা এইমুহূর্তে একেবারেই নেই। আর ঘোষাল জেঠিমার মুখে,থেকে থেকেই ফুটে আসছিল, একটা শব্দহীন চওড়া হাসি।

****

মিলি চোখ খোলার সাথে সাথে, শুনতে পেল,কাছাকাছি, অনেক মানুষের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ। মিলি ধড়পড় করে,উঠে বসলো। চারিদিকে অন্ধকার। আবার অন্ধকার ও নয়। কারণ রাত্রির আঁধার খুব কাছাকাছি প্রচণ্ড কিছুর আলোয় মলিন। মিলি ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ালো। সে কোথায় আছে? এটা কী কল্পনা?নাকি বাস্তব? সে কী খেমি মায়ের স্মৃতিতে রয়েছে?কিন্তু স্মৃতি এত পরিষ্কার হয় কী করে? মিলি বুঝতে পারছে না,সে কী করবে এখন?

খেমি মা বলেছে, তার একটাই কাজ। সেই কাজ শেষ করে,সে যেন দ্রুত ফিরে আসে। কিন্তু সেই কাজ শুরু করবে কীভাবে?যেই জায়গাটায় সে দাঁড়িয়েছিল, তার চারিদিকে বেশ গাছগাছালি। কিন্তু গাছের গোড়াগুলো পরিষ্কার। জঙ্গলের মত আগাছায় পরিপূর্ণ নয়। তাহলে কারো বাগান হতে পারে।

ওদিকে আচমকাই হই হট্টগোলের আওয়াজটা বেড়ে গেলো। মিলি দেরী না করে সেই আওয়াজ আর আলোর দিকে এগিয়ে গেলো। ওই তো ওদিকে, কিছু লোক দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, আওয়াজটা তো ওদের কাছ থেকেই আসছে। ওদের কে, সে কী কিছু জিজ্ঞাসা করবে? কিন্তু কিছুটা যেতেই কে যেন তার পা জোড়া মাটিতে গেঁথে দিলো। এ কী দেখছে সে? কিছু মানুষ

মুখে গামছা কাপড় বেঁধে একটা জ্বলন্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে,উল্লাস ধ্বনি দিচ্ছে। সেই বাড়ি হতে ভেসে আসছে, একটা পুরুষের মরণ আর্তনাদ। যেন,বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে তাঁরা খুব খুশি হয়েছে। কিন্তু এটা কার বাড়ি? মিলি ধীর পায়ে, প্রায় নিজেকে লুকিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলো, সেই বাড়ির ঠিক অনতিদূরে পড়ে রয়েছে,এক গর্ভবতী মহিলা। স্থির,অবিচল। মুখটা এতোদূর থেকে পরিষ্কার বোঝা না গেলেও, মিলি বুঝতে পারছে। ওই হল ফুলি। আর এই বাড়ির মধ্যে যাকে জ্যান্ত জ্বালাচ্ছে, সে হল ফুলির স্বামী। দেখতেই দেখতেই কিছুক্ষণের মধ্যে, উল্লাসিত জনগণ,জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতেই আচমকা গর্ভবতী মহিলাটা আর্ত চিৎকার করে উঠল প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। মিলি বুঝতে পারল,ফুলির গর্ভে যে পিশাচ রয়েছে, সে জন্মানোর জন্য প্রস্তুত। খেমি মা, তাকে বলেছিলেন,পিশাচটিকে জন্মানোর সময়ই মেরে ফেলতে হবে। অর্থাৎ এটাই সঠিক সময়। একমুহূর্ত দেরী করল না মিলি, প্রায় ছুটে সে ফুলির কাছে পৌছতে গিয়েই সে মাঝপথে এমন কিছু দেখল, তারপর মিলির মনে হল,তার সারা শরীরটা আচমকা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে গিয়েছে। যে গর্ভবতী মহিলা এই মুহূর্তে তার সামনে শুয়ে প্রসব যন্ত্রণায় ছটপট করছে, আর যাকে সে ফুলি ভাবছিল, তাকে অবিকল মিলির মত দেখতে। সেই মুহূর্তে মিলির চোখের সামনে ফুটে উঠল, সেই স্বপ্নের দৃশ্য,যা সে এতদিন দেখে আসছিল একটানা। স্বপ্নের মত, এখানে,তার মুখোমুখি প্রসব যন্ত্রণায়, সেই শুয়ে রয়েছে। শুধু প্রেক্ষাপটটুকু আলাদা।

ফুলির গলা চিরে, প্রচণ্ড একটা চিৎকার। আচ্ছা,সে যে ফুলির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে? কই ফুলি তো তাকে তার মত কাউকে সামনে দেখে অবাক হচ্ছে না। তারমানে, ফুলি কী তাকে দেখতে পাচ্ছে না?

****

বর্ষার ঘোলাটে জলে, পাগলা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জলের তলে।

খেমি মা, ওই বুড়িকে বলেছিলেন,টর্চের আলোটা জ্বালিয়ে রাখতে। সেই আলোর আভা, জলের নীচে কম হলেও এসে পৌঁছাচ্ছিল। সেই মত একটা বড়সড় শ্বাস টেনে জলের ভেতরে ডুব দিয়েছিল পাগলা। কিন্তু আচমকা,টর্চের আলো বন্ধ হয়ে যেতেই জায়গাটা ডুবে গিয়েছে নিকষ অন্ধকারে।

পাগলা তারপরেও কোনো ভাবে, ওইভাবেই জলের তলে ডুবসাঁতার দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে, এসে নেমেছে খুঁড়ে রাখা কবরের মাঝে।

সে ডুব সাঁতার দিয়েই, ছোট্টও দেহটা খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু অন্ধকারে,সে বুঝতে পারছে না, কী করবে? ওদিকে ধীরে ধীরে বুকের দমটা ফুরিয়ে আসছে। খেমি মা বলেছেন, একডুবে জিনিসটা তুলতে। না,দম ফুরিয়ে যাওয়ার আগে, জিনিসটা তুলতেই হবে। যে করেই হোক।

সে জলের তলে ওইভাবেই হাতড়াতে লাগলো মাটি। সেই জিনিসড়টা এখানেই থাকবে। সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে। কিছু একটা জিনিস,এই অগভীর ছোট গর্তের মধ্যেও, নাগাল এড়িয়ে বারবার পালানোর চেষ্টা করছে। যেন,জিনিসটা ধরা দিতে চাইছে না, তাকে। সে জলের ভেতরে শুনতে পাচ্ছে শিশুর খিলখিলে হাসির শব্দ, যেন ভীষণ মজা পাচ্ছে সেই শিশু। পাগলা বুঝল এভাবে হবে না। ওই ভয়ঙ্কর অপশক্তি, সে যতই শিশুর রূপে থাক,সে তার কাছে কিছুতেই ধরা দেবে না।

পাগলা,এও বুঝল তাকে কী করতে হবে, সে সাথে সাথে মনে মনে পাঠ করতে লাগলো,সেই মন্ত্র ছড়া,

“অদনবন্ধী বদনবন্ধী

বন্দী হল নাম

বন্ধী আকাশ বন্ধী বাতাস

মন্ত্রবন্দী কাম”

মন্ত্রপাঠের সাথে সাথে সে হাতড়াতে লাগলো,জায়গাটাকে। আর ঠিক তার পর মুহূর্তে কীসের একটা স্পর্শ পেয়েই সেই দুহাতে জিনিসটাকে জাপটে ধরল দুহাতে। দুটো ছোট ছোট পা,তার হাতের লাগালে। কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিতে, সেই পাদুটো মুক্ত হতে চাইছে,তার হাতের বাঁধন থেকে। কিন্তু, এই পা জোড়া তো তার ছাড়লে হবে না। তাকে একে নিয়েই ওপরে যেতে হবে। পাগলা,দুপায়ের ওপর চাপ নিয়ে শরীরটাকে জলের ওপরে ভাসিয়ে তোলার জন্য ঠেলল,সাথে সাথে কিছু একটা ভারী জিনিস, তার পিঠে জাঁকিয়ে বসলো। পাগলা অন্ধকারে,বুঝতে পারলো না। জিনিসটা কী। কিন্তু দুটো সুরু সরু কালো হাত পেছন থেকে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। এই দেহকে আমরা একটু আগেই দেখেছি জলে নামতে। এই সেই দেহ, যার কোমরের থেকে নীচের অংশ অনুস্পস্থিত।

খেমি মা, ঘোষাল জেঠিমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, “ তোর কী মনে হচ্ছে আমি জানতাম না যে তুই আসবি?”

সেই কথা শোনার পরই,আচমকা ঘোষাল জেঠিমা থেমে গেলেন।

“আমি জানতাম তুই আসবি। যে কারোর রূপ ধরেই তুই আসবি। আর তুই কেন এসেছিস সেটাও জানি। তুই অতীতে ফিরতে চাস। ফিরে তুই মিলিকে সেই সময় আটকাতে চাস। আর সেটাও না পারলে, মিলিকে শেষ করতে চাস। তাই না?”

আচমকাই ঘোষাল জেঠিমা,টানটান হয়ে দাঁড়ালেন। খেমি মা যে তার অভিসন্ধি আগে থেকেই বুঝতে পেরে গিয়েছে,সেটা বুঝতে পেরেই পিশাচের গলা থেকে বেরিয়ে এলো একটা চাপা গর্জন।

“কিন্তু তার জন্য তো তোকে,আমায় ডিঙিয়ে মিলিকে স্পর্শ করতে হবে। আর আমি তোকে সেটা কিছুতেই করতে দেব না। “ এমারজেন্সির আলো খেমি মাএর দৃঢ় মুখের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে।

ঠিক এমন সময় টুবির ভেতরে জলের ভেতরে হুটোপুটির শব্দ।

চমকে উঠে খেমিমা সেদিকে তাকাতেই। আচমকা ঘোষাল জেঠিমা রূপী সেই বিকট দেহটা, চিৎকার করে ছুটে এলো মিলির অচৈতন্য দেহের দিকে।

সাথে সাথে খেমি মা,মাথার জটার বাঁধন আলগা করতেই সেটা সেটা কাদামাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো বিড়বিড়ে মন্ত্র পাঠ। সাথে সাথে কী একটা হল আর ঘোষাল জেঠিমার শরীরটা ছিটকে পড়ল জঙ্গলের একপাশে বেশ খানিকটা দূরে। খেমি মা টানটান হয়ে সোজা ভাবে দাঁড়ালেন,কে বলবে খেমিমা একজন অশীতিপর বৃদ্ধা। তার শরীরে যেন ভর করেছে, এক দৈব তেজ। তিনি একমুহূর্ত দেরী না করে, ওই অন্ধকারের মধ্যেই টুবির জলে বাম পা ডুবিয়ে,আলগা জটার প্রান্ত ভাগ দিয়ে জলের মধ্যে আঁকিবুকি কাটতে লাগলেন। আর করতে লাগলেন মন্ত্রপাঠ।

****

একটু একটু করে, হাতটা পেছন থেকে সাড়াশির আকারে,চেপে বসছে পাগলার গলায়। অবশিষ্ট দমটুকুও এই চাপে বেরিয়ে পড়ছে বুকের ভেতর থেকে। আবার দেহটা এমন ভারী হয়ে চেপে বসেছে পিঠের ওপরে, যে সে জলের ওপরে উঠতেই পারছে না। ওদিকে হাতের নাগাল থেকে সেই শিশুর পা জোড়া যেন ছাড়া পেতে মরিয়া। দুদিক থেকে দুটো অমানুষিক চাপ। পাগলা কে একটু একটু করে শেষ করে, দিচ্ছে। পাগলা টের পাচ্ছে,একটু একটু করে তার প্রাণ বায়ু ফুরচ্ছে।

আর ঠিক তখনই কী একটা হল। আচমকা, পাগলা টের পেল কেউ যেন এক ঝটকায় পিঠ থেকে সেই ভারী বস্তুটা টেনে নিয়ে গেলো। সাথে সাথে দেহটা হালকা হয়ে যেতেই ভুস করে জলের ওপরে ভেসে উঠল সে। আর ঠিক তখনই সে দেখল। টুবির প্রান্তে দাঁড়িয়ে খেমি মা কী একটা করছেন। আর তার সেই বৃদ্ধা খেমি মাএর দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে একটা উজ্জ্বল আভা।

****

একদিকে দাউদাউ করে বাড়ীটা জ্বলছে। পোড়া বাড়ির উদ্ধত লেলিহান শিখা যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। সেই আগুণের উজ্জ্বল হলুদাভ আলোয় মিলি দেখল, ফুলির দুপায়ের ফাঁক থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে। একটা কালো মত কিছু... সে জানে কী বেরিয়ে আসবে ওখান থেকে, একটা ভয়ঙ্কর জীব। যেই জীবের বর্ণনা,মিলির প্রায় মুখস্থ। সে দেরী না করে কিছু একটা খুঁজতে লাগলো,কিছু একটা। এমন কিছু যা দিয়ে এই ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে নিকেশ করা যাবে। মিলি পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো, আর ঠিক তখনই তার নজরে পড়ল, একটু আগেও লোকগুলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে একটি কাটারি পড়ে রয়েছে।

মিলি আর একমুহূর্ত দেরী না করে সাথে সাথে তুলে নিলো, সেই কাটারিখানা। ওদিকে জিনিসটা পুরোপুরিই বেরিয়ে এসেছে, ফুলির গর্ভ থেকে। ওদিকে ফুলি ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে, মাটির ওপর। জিনিসটা ফুলির গর্ভ থেকে বেরিয়ে হাঁপাচ্ছে যেন। দুটো হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো একটা কালো কুচকুচে শরীর। যার কোমরের থেকে নীচের অংশ গায়েব।

মিলি জিনিসটা থেকে, হাত পাঁচেক দূরে,হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু আজ এখন অজানা কারনেই আর ভয় করছে না। ওই তো জিনিসটা তাকে দেখতে পেয়েছে। ওই তো ঘাড় হেলিয়ে তাকে দেখে হাসছে। এই... এইবার ওটা এগিয়ে আসবে ওর দিকে। মিলি দাঁতে দাঁত চেপে, ইচ্ছা করে,একপা পিছিয়ে যেতেই জিনিসটা ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এলো মিলির দিকে। আর সাথে সাথে,মিলি উঠে দাঁড়িয়ে, কাটারির কোপ বসিয়ে দিলো জিনিসটার মাথার ওপর। একবার নয়, বারবার। বারবার। বসাতেই থাকলো যতক্ষণ না, জিনিসসার শক্ত মাথার খোল থেঁতলে যায়।একটা কালো তরল বেরিয়ে এসেছে জিনিসটার দেহ থেকে। সেই তরলে, মিলির পুরো শরীরটা ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে উঠে দাঁড়ালো প্রশান্ত

চিত্তে। একটা শান্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো, মিলির বুকের ভেতর থেকে। খেমিমা র কথা মত সে যুদ্ধে জয়ী হয়ে পেরেছে। শেষ করতে পেরেছে, ফুলির গর্ভজ পিশাচ কে। এখন এর শুধু একটু সদ্গতি করা প্রয়োজন। কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে জ্বলন্ত বাড়ির দিকে তাকালো। মিলি আর দেরী না করে, , কাটারী দিয়েই জিনিসটার সাথেই ফুলির গর্ভের সংযোগ নারীটা কেটে দিলো। তারপর একহাতে কাটারি,আর একহাতে সেই পিশাচের মৃতপ্রায় দেহটার একটা হাত ধরে টানতে টানতে সেই জ্বলন্ত বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। আগুনে পুড়েই অন্তিম পরিণতি পাবে এই পিশাচ। সেটাই তার উপযুক্ত জায়গা।

মিলি দ্রুত পায়ে সেই জ্বলন্ত বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। খেমিমা বলেছেন। পিশাচ কে শেষ করে,সে যেন এক মুহূর্ত বেশি এখানে না থাকে। হ্যাঁ, সে থাকবে না। তাকে ফিরতে হবে। নিজের মানুষদের কাছে। আর মাত্র,কয়েকটা পা, তাপরেই সে এই পিশাচ দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলবে অগ্নিকুণ্ডে,ঠিক এমন সময়ই পেছন থেকে একটা চিৎকার।

চমকে পেছন ঘুরল মিলি।

একজন সন্ন্যাসী পাগলের মত হন্যে হয়ে কিছু খুঁজছে ফুলির কাছে। কিন্তু পাচ্ছে না। তাই সে ভয়ঙ্কর ভাবে চিৎকার করছে। পা দিয়ে লাথি মারছে ফুলির পেটে আর যোনিতে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে ফুলি। মিলি এতো দূর থেকেও স্পষ্ট চিন্তে পারল সন্ন্যাসীকে। মাদুবাবা ওরফে মাকড়ীবাবা। আর লোকটাকে দেখা মাত্রই মিলির আপাদ মস্তক জ্বলে উঠল প্রচণ্ড রাগে। এত অন্যায় করার পর,সে এরপর ও অত্যাচার করছে ফুলিকে?এর অন্যায়ের কোন শাস্তি হবে না? কেন হবে না?হতেই হবে। মিলি একবার সেই এলিয়ে পড়া পিশাচ দেহটার দিকে তাকালো। তারপর তার তাকে ঠিক বাড়ির মুখের সামনে রেখেই আবার পেছন ঘুরে এগিয়ে গেলো, ফুলির দিকে।

এত অন্যায় করে, এই মানুষের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। প্রচণ্ড রাগে,এঁর প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ মিলি ভুলে গেলো, খেমি মায়ের সতর্ক বার্তা।

******

পাগলা ধীরে ধীরে জলের তলে উঠেই ভয়ঙ্কর ভাবে কাশতে লাগলো।

খেমি মা দেখলেন তার হাতে ধরা রয়েছে, সেই শিশু। কিন্তু সে যেন পাগলার হাতের নাগাল থেকে বেরোনো জন্য আকুপাকু করছে। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে পাগলা কী অমানুষিক অমানুষিক শক্তিতে জাপটে ধরে রয়েছে,শিশুটিকে। খেমি মায়ের নির্দেশ। শিশুটিকে মায়ের চাই। মায়ের আদেশ,সে পালন করেছে।

"তুই ঠিক আছিস বাবা। " পাগলার বুকে হাত বোলাতে বোলাতে, কান্না ভেজা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলেন খেমি মা।

"আমি ঠিক আছি মা। এই... এই যে সেই পিশাচ। " কথাটা বলেই সে সেই শিশুটিকে বাড়িয়ে দিলো খেমি মা র দিকে। খেমি মা, শিশুটিকে বুকে আঁকড়ে ধরতেই দেখা গেলো, শিশুটির অস্থিত্রতা যেন থেমে গেলো। সে স্থির ভাবে খেমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"এই পিশাচ, অনেক শক্তিশালীরে পাগলা। তবে,এর শক্তি কোথায় সবচেয়ে বেশি জানিস? এ এক সঙ্গে অনেক শরীরে একেবারে থাকতে পারে। আর প্রত্যেকটি শরীর। একই শক্তিতে শক্তিশালী। "

খেমি মা কথাটা বলার সাথে সাথেই, ঠিক ওদের পেছন থেকে একটা খিকখিকে হাসির শব্দ।

চমকে উঠল, খেমি মা আর পাগলা।

ওরা দুটিতে নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত ছিল। তার ফাঁকেই কখন যে ঘোষাল জেঠিমার রূপ ধরে থাকা পিশাচ মিলির দেহের পাশে এসে বসেছে, সেটা

ওরা দুজনেই টের পায়নি। আর যখন বুঝল তখন অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। এই পিশাচ মিলিকে স্পর্শ করা মাত্রই, ফিরে যাবে অতীতে।

"ঠিক বলেছিস, অনেক দেহ...। অনেক দেহ। অনেক শক্তি। ওই দেখ। " কথাটা বলেই সে ওদের পিছনে, সেই টুবির দিকে নির্দেশ করতেই। ওরা চমকে পেছন ঘুরল। আর পেছন ঘুরতেই ওরা শিউরে উঠল। কারণ জল থেকে তখন ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, অনেকগুলো শরীর। সেই শরীর,যারা চাইপাট থেকে এতদিন নিখোঁজ ছিল।

আচমকা মিলির দেহের কাছে ধপ করে একটা শব্দ। আর দেখা গেলো ঘোষাল জেঠিমার প্রাণহীন দেহ,মিলির দেহের পাশেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। পিশাচ মিলির দেহ স্পর্শ করেই ফিরে গিয়েছে অতীতে। মিলিকে শেষ করতে।

******

ওদিকে,মাকড়িবাবা তার পা খানা চেপে ধরেছে, ফুলির গলায় প্রচণ্ড আক্রোশে। মিলি,কাটারি তুলে ছুটল মাকড়ি বাবার দিকে। কিন্তু মাকড়ি বাবা, মিলির এগিয়ে আসা দেখতে পাচ্ছে না। এখানে,কেউ মিলিকে দেখতে পায়নি, একমাত্র ওই পিশাচটি ছাড়া। কিন্তু আচমকা,মিলি থমকে গেলো। মাকড়িবাবা,প্রচণ্ড আক্রোশের সাথে চিৎকার করছে।

" হ্যাঁ, আমিই সেই যে তোর গর্ভের সন্তান নষ্ট করছে..."

কয়েক মুহূর্তের জন্য সময় নিয়ে ভাবল মিলি। মাকড়ি বাবার এই স্বীকারোক্তি ফুলির জানা প্রয়োজন। নাহলে,সে সারাজীবন, চাইপাটের লোকেদের অভিশাপ দিয়ে যাবে তার দুর্গতির জন্য। কিন্তু এটা তো সত্যি নয়। আসল কালপ্রিট যে এই সন্ন্যাসী, সেটা জানা ফুলির প্রয়োজন। ভীষণ ভাবে প্রয়োজন।

পুরো কথাটা শেষ করে, মাকড়ি বাবা,যেই পা খানা আরো জোরে টিপে ধরল, ফুলির গলায়। মিলি আর একমুহূর্ত দেরী করলও না। শরীরের সমস্ত

রাগ জড়ো করে, সে একটা প্রচণ্ড কোপ বসালো মাদুবাবার গলায়। আর সাথে সাথে, মাদুবাবা ওরফে,মাকড়ি বাবার মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা হয়েই একপাশে ধপ করে পড়ে গেলো। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত, চাঁইপাটের মাটি ভিজিয়ে দিতে লাগলো। বলা ভালো, রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিতে লাগলো।

ওদিকে ফুলি অবাক হয়ে পুরোটা দেখল। তার চোখ এটা বিশ্বাস করতে পারছে না,আচমকা কী করে একটা লোক মুণ্ডুহীন হয়ে এইভাবে মারা পরতে পারে।

মিলির সেই অবাক হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের প্রশান্তি এলো। নাহ,আর তার কোন আক্ষেপ নেই। অশরীরের সঙ্গে সশরীরের পিশাচের ও নিধন প্রয়োজন ছিল। সত্যি ছিল।

সে আর দাঁড়ালো না। কাটারিটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে। জ্বলতে থাকা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

আর ঠিক তখনই, পেছন থেকে কে যেন আচমকা তার কাঁধের ওপরে লাফিয়ে উঠতেই, মিলি মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। সে অবাক হয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পেল। মাকড়ি বাবার মুণ্ডুহীন দেহটা তার বুকে চেপে বসেছে। শুধু বুকে চেপেই নয়। ধীরে ধীরে দুই হাত দিয়ে তার গলাটাও টিপে ধরছে। মিলির দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুচোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সে কী এখানেই এভাবে মারা পড়বে? এভাবে? আর ঠিক তখনই মিলি দেখল,মাকড়ি বাবার ধড়ের কাটা অংশটা থেকে যেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরচ্ছিল,ঠিক ওই জায়গাটা ফুঁড়ে দুটো কালো কালো হাত বাইরে বেরিয়ে আসছে।

****

চারদিক থেকে ওদের দেহগুলো ঘিরে ধরেছে অনেকক্ষণ। এখন ধীরে ধীরে বৃত্তটা ছোট করছে পিশাচেরা।

পাগলা,চিৎকার করে উঠল, “খেমি মা?এবার এবার কী হবে?”

খেমি মা একমুহূর্ত দেরী না করে, সেই শিশুটিকে মিলির অচৈতন্য দেহের ওপরে রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"পিশাচ কী মনে করলও? একমাত্র সেই অতীতে ফিরতে পারে?আর কেউ না? মিলিকে বাঁচাতে সেই যাবে,মাদুবাবার পোড়া ঘরে কাপড়ের টুকরো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যে আবার ফিরে এসেছে। "

পাগলা অবাক, "কে? মুক্তি পেয়েছে মা?"

খেমিমা,সেই কথার উত্তর না দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,

"উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি...। "

আর তারপরেই একটা দমকা বাতাস। পাগলা সহ বাকী সকলে অবাক হয়ে দেখল। একটা ধোঁয়ার মত অবয়ব ধীরে ধীরে মিলির শরীরে প্রবেশ করলও।

আর ঠিক তখনই, খেমি মা, বিড়বিড় করে উঠলেন,"মন্ত্রমা!"

****

ওদিকে মিলি বুঝতে পারছে, সে মারা যাচ্ছে। সে আর ঠিক করতে পারবে না কিছুই। তার দুচোখে অন্ধকার। আর ঠিক তখনই, তার মনে পড়ল,খেমি মায়ের সেই কথা,

"প্রচণ্ড অন্ধকারে যখন চোখ ঢেকে যাচ্ছে তখন তুই নিজে কী, সেটা আগে মন থেকে বিশ্বাস করিস। "

আমি?আমি কে? আমি কে? আমি মিলি?না আমি ফুলি? নাহ, আমি মিলি বা ফুলি নই। আমি মন্ত্রমা! আমি মন্ত্রমা!

উলি উলি উলি

উলির বেটি ফুলি...

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড অন্ধকার সরে গিয়ে তার সামনে ফুটে উঠল,একটা দৃশ্য।

সদ্য সন্তান হারানো ফুলি,মাকড়ি বাবার দেহের ঠিক যে অংশ থেকে পিশাচ বেরিয়ে আসছিল,সেই অংশে, ক্রমাগত কাটারির কোপ মারছে। মেরেই যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দেহটা একপাশে লুটিয়ে পড়ছে, কিন্তু ফুলি কাটারির কোপ থামাচ্ছে না। ধড়পড় করে উঠে দাঁড়ালো মিলি। নাহ আর একমুহূর্ত এখানে না।

সে একপাশে ছিটকে পড়া মৃতপ্রায় অর্ধদেহটার হাত ধরে হ্যাচড়াতে হ্যাচড়াতে, সেই জ্বলতে থাকা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলও মিলি। সাথে সাথে একটা গরম আগুণের ঝলকা দেহ ছুঁয়ে ফেলতেই আচমকা একটা ধাক্কা খেল।

মিলি দেখল, সে বসে রয়েছে,একটা গাড়ির ফ্রন্টশিটে, আর অনল তাকে ডাকছে। ঘোর কাটতে কয়েকমুহূর্ত সময় লাগলো তার।

“কী গো? আর কত ঘুমোবে?চাইপাটে, সুভাসপল্লীতে চলে এসেছি তো। “ ঠিক তারপরেই অনলের ফোনটা বেজে উঠল, অনল ফোনটা রিসিভ করে বলল,হ্যাঁ, দসবাবু। চলে এসেছি। মাত্র নামলাম। বাড়ির চাবিটা?ওহ, হ্যাঁ হ্যাঁ। মুভারস রা মালপত্র নামাচ্ছে। না,গিন্নি এখনো গাড়িতে। “

গাড়ি থেকে নেমে এলো মিলি। তার সামনে দোতালা একটি বাড়ি। এই বাড়ির নীচের তলা তাঁরা ভাঁড়া নিয়েছে। সুভাসপল্লী একটি চাইপাটের একটি কলোনি পাড়া। আজ অনল আর মিলি কলকাতা থেকে এখানে এসেছে। অনলের চাকরির বদলির সূত্রে ওদের এখানে আসা। এরপর থেকে, ওরা এখানেই থাকবে। এই চাইপাটেই।

কিন্তু মিলির মনে অন্য চিন্তা। মিলি বুঝতে পারল না,কখন যেন তার চোখ লেগে গিয়েছিল, ঠাণ্ডা বাতাসে। সে কী স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ? কিন্তু কী স্বপ্ন

দেখছিল এতক্ষণ মনে করতে পারছে না কেন? আচ্ছা, আপানারা কী মনে করতে পারছেন?

(সমাপ্ত)